বিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকা।

পাক্ষিক পত্র।

চৈত্র

১ম বর্ষ } শ্রীশ্রীচৈতন্যাব্দ ৪০৫। ~~২৩ ফাল্গুণ~~, পূর্ণিমা। { ১ম সংখ্যা।

পণ্ডিত শ্রীপ্রভু রাধিকা নাথ গোস্বামী

ও

ভক্তি বিনোদ শ্রীযুক্ত কেদার নাথ দত্ত কর্ত্তৃক

সম্পাদিত।

—০০০—

কলিকাতা।

বাগবাজার ২নং আনন্দ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের গলি

স্মিথ এণ্ড কোম্পানির যন্ত্রে

শ্রীকেশব লাল রায় দ্বারা

মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বার্ষিক মূল্য ২৲ প্রতি খণ্ড ৵

বিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকা।

আরম্ভ।

বৈষ্ণব ধর্ম্মের চর্চ্চা ও প্রচার এই পত্রিকার মূখ্য উদ্দেশ্য। শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভু জীবকে যে ধর্ম্ম শিক্ষা দেন, তাহাকে আমরা বৈষ্ণব ধর্ম্ম বলি। আমরা শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভুকে পূর্ণ অবতার বলিয়া মানি। কিন্তু আমাদের অন্য কোন দেবতার কি ধর্ম্মের প্রতি দ্বেষ করিতে প্রভুর আজ্ঞা নাই। বরং জীব ও ধর্ম্ম মাত্রে শ্রদ্ধা করা তাঁহার আজ্ঞা।

প্রকৃত কথা, জীব মাত্রে একরূপ ধর্ম্ম পালন করিতে পারে না। অধিকার ভেদে ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মের প্রয়োজন। একটী সাঁওতালকে গীতার ধর্ম্ম শিখাইলে সে গ্রহণ করিতে পারে না। এক জন সিদ্ধ ভক্তকে রক্তারক্তির ধর্ম্ম শিখাইতে গেলে তিনি তাহা অবজ্ঞা করিয়া ফেলিয়া দিবেন। কোন এক মৃগয়াপ্রিয় জাতি বিশ্বাস করে যে, শ্রীভগবান অত্যন্ত শিকারী, ও স্বর্গে কেবল স্বীকার করিয়া বেড়াইতে হইবে। কোন এক নিষ্ঠুর জাতি বিশ্বাস করে যে, ভগবান অতি নিষ্ঠুর ও স্বর্গে শত্রু বিনাশ করাই একমাত্র সুখ।

শ্রীগৌরাঙ্গের ধর্ম্ম মনুষ্যের বুদ্ধির চরম। রামানন্দ রায় শ্রীগৌরাঙ্গের সঙ্গে ধর্ম্মবিচার করিতে করিতে বলিয়াছিলেন যে, ইহার অধিক আর

বুদ্ধি যায় না। বস্তুতঃ তাহা অতিক্রম করা আর জীবের সাধ্য নাই। খ্রীষ্টীয় সাধুগণ শ্রীভগবানকে পিতা ও প্রভু বলিয়া তৃপ্ত হইলেন। মুসলমান সাধুরা তাঁহাকে সখা বলিলেন। শাক্ত হিন্দু সাধুগণ তাঁহাকে জননী পর্য্যন্ত বলিলেন। কিন্তু শ্রীগৌরাঙ্গ তাঁহাকে প্রাণকান্ত বলিলেন।

কেবল ইহাও নয়। শ্রীগৌরাঙ্গ তাঁহাকে বঁধুয়া বলিলেন। যাঁহাকে প্রাণ সমার্পন করা হইয়াছে তাহাকে বঁধুয়া বলে। বঁধুয়া কে, না যাহার নিমিত্ত প্রেম পাগলিনী রমণী কুল ধর্ম্ম, পতি পুত্র, ত্যাগ করে। ভগবানের প্রতি জীবের সম্বন্ধের মূল ইহা অপেক্ষা আর গাঢ় অনুভবে আইসে না। সুতরাং যিনি শ্রীগৌরাঙ্গ আনিত ধর্ম্মের আশ্রয় লইতে পারিয়াছেন, তিনি জীবের মধ্যে সর্ব্বোচ্চ অধিকারী ॥

পূর্ব্বে যে পথ দুর্গম ও কণ্টকাকীর্ণ ছিল, সেই নিত্য ধামে যাইবার পথ শ্রীগৌরাঙ্গ জীবের মঙ্গলের নিমিত্ত প্রশস্ত করিয়াছেন। এবং তাঁহার কৃপায় এখন সে পথ কুসমময় হইয়াছে।

ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা বিজ্ঞান শাস্ত্র লইয়া বিব্রত। হিন্দু সাধুগণের শিক্ষা আর একরূপ। তাঁহারা বলেন যে, ইহ কালের সুখ সুখ নহে, পরকালে ভাল হয় ইহার উপায় করা জীবমাত্রেরই প্রধান উদ্দেশ্য। প্রকৃত পক্ষে, আমরা সকলেই মরিব, সুতরাং এ পৃথিবী আমাদের চিরবাসস্থান নয়। বুদ্ধিমান লোক মাত্রের কর্ত্তব্য পরকালটি ঠিক রাখা। যাঁহাদের এ চৈতন্য হইয়াছে, তাঁহারা একবার শ্রীগৌরাঙ্গের লীলা পাঠ করুণ, তাহা হইলে তাঁহাদের মন নির্ম্মল, আর সমুদায় তত্ত্ব পরিষ্কার হইবে।

হরি সংকীর্ত্তনের খেলা।

শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভু যখন দিগম্বর শিশু, তখন তিনি শিশুগণ লইয়া হরি সংকীর্ত্তনের খেলা খেলিতেন। শিশুগণকে স্পর্শ কি আলিঙ্গন করিলে তাহারা উন্মত্ত হইয়া নাচিত, এমন কি, বৃদ্ধগণ ও পণ্ডিতগণও তাহাতে আকর্ষিত হইতেন। শ্রীচৈতন্যমঙ্গল অবলম্বন করিয়া এই নিম্নের আখ্যায়িকাটী লিখিত হইল।

সব শিশু মেলি গলে বন মালা পরেছে।
করতালি দিয়া হরি হরি বলে নাচিছে ॥
শিশু ধরি কোলে, নিমাই আধ বলে,
বলে বোল হরি বোল।
আলিঙ্গন পেয়ে, উঠয়ে মাতিয়া,
নাচে বলে হরিবোল ॥
মাঝে গড়ি যায়, নিমাই ধুলায়,
হরি বলে উভরায়।
শিশু গণে বেড়িয়া, করে কর ধরিয়া,
নাচিয়া নাচিয়া যায় ॥
বৃদ্ধ কিবা বিজ্ঞ, প্রবীণ পণ্ডিত,
পথে যায় সেই কালে।
হাঁসিবার মন, উলটা ঘটন,
সান্ধাইল সেই দলে ॥
শিশু বৃদ্ধ সনে, আবিষ্ট হইয়া,
নাচে আর হরি বলে।
লজ্জা নাই করে, সুখে নৃত্য করে,
ঊর্দ্ধে দুই বাহু তুলে ॥

কলসী লইয়া, নাগরিয়াগণ,
নাচিবারে মন ধায়।
দাঁড়াইয়া দেখে, জল বহে চোখে,
দারুণ কুলের দায় ॥
হরিধ্বনি শুনি, বুঝিলেন আই,
এ সব নিমাই কর্ম্ম।
ধাইয়া আইল, ভৎর্সিতে লাগিল,
এই কি তোদের ধর্ম্ম ?
খেপা ছেলে পেয়ে, পাগল করিয়া,
পাইছ মনেতে সুখ।
এক পুত্র এই, আর মোর নাই,
বুঝনা পরের দুঃখ ॥
ভৎর্সনা শুনিল, চেতন পাইল,
বিজ্ঞ জন ভাবে মনে।
একি অকস্মাৎ, কি ভাব হইল,
মতিচ্ছন্ন হলো কেনে ॥
ঘরে গেল আই, পুত্র কোলে করি
বনমালা গলে দোলে।
আই কোল হতে, আনন্দিত চিতে,
লইল বলাই কোলে ॥

শ্রীগৌরাঙ্গের গৃহ ত্যাগ ।

শ্রীগৌরাঙ্গ যখন গৃহ ত্যাগ করেন, তখন তাঁহার ভক্তগণ দুঃখে ও শোকে নিতান্ত বিহ্বল হন। সুতরাং সেই সময়ের সমুদয় ঘটনা গুলি পরিষ্কার রূপে জানা যায় না। আমি যত দূর জানিতে পারিয়াছি ভক্তগণকে নিবেদন করিতেছি।

প্রকৃত ঘটনা গুলি জানিতে হইলে, যে যে ভক্তগণ যাহা প্রত্যক্ষ দেখিয়া লিপি বদ্ধ করিয়াছেন, তাহাই গ্রহণ করিতে হইবে। শ্রীগৌরাঙ্গের প্রধান পারিষদ শ্রীমুরারী গুপ্ত। তাঁহার বাড়ী প্রভুর বাড়ীর নিকট ছিল, ও প্রভুর পিতার সহিত তাঁহার আত্মীয়তা ছিল। তিনি যাহা বলিয়াছেন তাহা ঠিক বলিয়া লইতে হইবে। এই মুরারী গুপ্তকে দামোদর পণ্ডিত প্রভুর আদি লীলা বর্ণনা করিতে অনুরোধ করেন। মুরারী গুপ্ত ইহা বর্ণনা করেন, ও দামোদর পণ্ডিত উহা সূত্র রূপে গ্রন্থিত করেন। ইহাকে মুরারী গুপ্তের কড়চা বলে। আর এই কড়চা অনুবাদ করিয়া শ্রীলোচন দাস ঠাকুর তাঁহার চৈতন্য-মঙ্গল লিখিয়াছেন।

এই চৈতন্য-মঙ্গলে দেখা যায় যে, প্রভু ক্রমে ক্রমে শ্রীরাধা ভাবে কৃষ্ণ বিরহে একেবারে অধীর হইয়া পড়িলেন। চৈতন্য মঙ্গল সে বিরহ এইরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। প্রভু ভক্তগণের গলা ধরিয়া এই বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন :—

"নারিব নারিব হেথা রহিবারে আমি।
দেখিবারে যাব আমি বৃন্দাবন ভূমি ॥
এছার সংসারে, আমি কেমনে রহিব।
নন্দের দুলালে আমি কোথা গেলে পাব ॥

এতবলি ছিড়িলেক গলার উপবীত ।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি গোরা ভেল মূরছিত ॥"

মাধব, বাসু, ও গোবিন্দ ঘোষ, তিন ভ্রাতাই প্রভুর পারিষদ ও বিখ্যাত কীর্ত্তনীয়া । নিম্নের পদটী গোবিন্দ ঘোষের । প্রভু গৃহত্যাগ করিবেন এই কথা গদাধর প্রভুর নিজ মুখে শুনিয়া মুকুন্দের নিকট ধাইয়া গিয়া বলিলেন ঃ—

"প্রাণের মুকুন্দ হে, আজি শুনিনু আচম্বিত ।
কহিতে পরাণ যায়, মুখে নাহি বাহিরায়,
শ্রীগৌরাঙ্গ ছাড়িবে নবদ্বীপ ।
ইহাত না জানি মোরা, সকালে মিলিনু গোরা,
অবনত মাথে আছে বসি ।
নিঝরে নয়ন ঝরে, বুক বাহি ধারা পড়ে
মলিন হৈয়াছে মুখ শশী ॥
দেখিয়া তখন প্রাণ, সদা করে আন চান,
সুধাইতে নাহি অবসর ।
ক্ষণেক সম্বিত হইল, তবে মুঞি নিবেদিল,
শুনিয়া দিলেন উত্তর ॥
আমিত বিবশ হইয়া, তারে কিছু না কহিয়া,
ধাইয়া আইনু তব পাশ ।
এইতো কহিনু আমি, যে কহিতে পার তুমি,
মোর নাহি জীবনের আশ ॥
শুনিয়া মুকুন্দ কান্দে, হিয়া থির নাহি বান্ধে,
গদাধরের বদন হেরিয়া ।
গোবিন্দ ঘোষ কয়, ইহা যেন নাহি হয়,
তবে মুঞি যাইব মরিয়া ॥"

পদটী দেখিলেই বোধ হয় যে, যখন গদাধর ঊর্দ্ধশ্বাসে মুকুন্দের নিকটে আসিয়া এই সংবাদ বলিলেন, তখন পদকর্ত্তা গোবিন্দ ঘোষ

সেখানে বসিয়াছিলেন । মন বিশেষ উত্তেজিত না হইলে পদ কর্ত্তারা পদ করেন না । গোবিন্দ প্রথম মুকুন্দের বাড়ীতে গদাধরের মুখে এই সংবাদ শুনিয়া অত্যন্ত বিচলিত হন, ও সেই নিমিত্ত এই পদটী করেন । নতুবা গদাধর দৌড়িয়া মুকুন্দকে বলিলেন, ইহা এরূপ প্রধান ঘটনা নয় যে ইহার নিমিত্ত একটী পদ হইতে পারে। একথা আই শুনিলেন ও পরে বিষ্ণুপ্রিয়া দেবিও শুনিলেন ।

মুরারী গুপ্ত বলিয়াছেন, এই কথা শুনিয়া আই প্রভুকে বলিলেন, তুমি নাকি আমাকে ও বউকে ফেলিয়া যাইবে ? ইহা বলিয়া ব্যাকুল হইয়া কান্দিতে লাগিলেন । তখন শ্রীগৌরাঙ্গ জননীকে বলিলেন, মা, তুমিও কি ভুলে গেলে ? সংযোগ ও বিয়োগ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং করিয়া থাকেন, তোমার কোন দুঃখ থাকে তাঁহাকে বল। তুমি নিমাই নিমাই বলিয়া কান্দিও না । যদি নিমাই বলে কান্দ, তবে আমাকেও পাইবে না, কৃষ্ণকেও পাইবে না । তুমি কৃষ্ণ বলিয়া কান্দ, তাহা হইলে কৃষ্ণকেও পাইবে ও নিমাইকেও পাইবে। প্রভু আরো বলিলেন,

"কিবা ভক্ত কিবা বিষ্ণুপ্রিয়া কিবা তুমি ।
যে ভাবিবে কৃষ্ণ তার কোলে আছি আমি ॥"

যে দিবস প্রভু গৃহত্যাগ করিবেন, তাহা দুই তিনটী ভক্ত ব্যতীত আর কেহ জানিতেন না । আইও জানিতেন না, বিষ্ণুপ্রিয়াও জানিতেন না । প্রভু শয়ন মন্দিরে গেলেন, ও একটু পরে বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী হস্তে চন্দনের বাটী, ফুলের মালা, তাম্বুলের বাটা লইয়া গৃহে প্রবেশ করিলেন ।

প্রভু মধুর হাঁসিয়া অভ্যর্থনা করিলে পর, দেবী প্রভুর অঙ্গে চন্দন লেপিয়া কপালে চন্দনের বিন্দু দিলেন । তাহার পরে গলায় ফুলের মালা পরাইয়া দিলেন, দিয়া সলজ্জ ভাবে বদন নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন । বিষ্ণুপ্রিয়া কেবল শৈশব অতিক্রম করিয়া যৌবনে পদার্পণ করিয়াছেন, বর্ণ যেন "কাঁচা বালা সোনা" রূপ অমানুষিক ;

তাহাতে আবার নাগরীগণ প্রভুকে সংসারে ভুলাইয়া রাখিবার নিমিত্ত প্রত্যহ নিশিতে বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীকে ভুবন মোহিনী বেশ পরাইয়া প্রভুর মন্দিরে পাঠাইতেন ।

চৈতন্য মঙ্গল বলিতেছেন যে, প্রভু প্রিয়ার ভুবন মোহিনী রূপ দর্শন করিয়া বলিলেন, আজ আমি তোমাকে একবার আপন হাতে সাজাইয়া দিব । ইহা বলিয়া প্রিয়াকে সাজাইতে লাগিলেন। চৈতন্য মঙ্গল বলেন ঃ—

"শয়ন আওয়াসে প্রভু শয়ন করিলা ।
তাম্বুল তবক করে বিষ্ণুপ্রিয়া গেলা ॥
হাঁসিয়া সম্ভাসে প্রভু আইস আইস বলে ।
পরম পিরীতে তাঁরে বসাইল কোলে ॥
বিষ্ণুপ্রিয়া প্রভু অঙ্গে চন্দন লেপিল ।
অগৌর কস্তুরি গন্ধে তিলক রচিল ॥
দিব্য মালতীর মালা দিল পহুঁ অঙ্গে ।
শ্রীমুখে তাম্বুল তুলি দিল নানা রঙ্গে ॥
তবে মহাপ্রভু সে রসিক শিরোমণি ।
বিষ্ণুপ্রিয়া অঙ্গে বেশ করেন আপনি ॥
সুন্দর ললাটে দেই সিন্দুরের বিন্দু ।
দিবাকর কোলে যেন রহিয়াছে ইন্দু ॥
সিন্দুরের চৌদিকে চন্দন বিন্দু আর ।
শশি কোলে স্বর্য্যতারা ধায় দেখিবার ॥
খঞ্জন নয়নে দেই অঞ্জনের রেখ ।
কাম কামনের গুণ আগে পরতেক ॥
অগুরু চন্দন গন্ধ কুচোপরে লেপে ।
দিব্য বস্ত্র পরিল কাঁচলি পরতেকে ॥

ত্রৈলক্যমোহিনী বেশ নিরখে বদন ।
অধর মাধুরি রসে করয়ে চুম্বন ॥
ক্ষণে ভুজলতা বেড়ি আলিঙ্গন করে ।
নব কমলিনী যেন করিবর কোলে ॥
নানা রস বিথারয় বিনোদ নাগর ।
আছুক অন্যের কাজ কাম অগোচর ॥
হৃদির উপরে থোয় না ছোয়ায় শয্যা ।
পাশ পালটিতে নারে দোঁহে এক মজ্জা ॥
বুকে বুকে মুখে মুখে রজনী গোঁয়ায় ।
এইরূপে দুই জনে সুখে নিদ্র যায় ॥"

শ্রীগৌরাঙ্গ ও বিষ্ণুপ্রিয়া সুখে শয়ন করিলেন ও নিদ্রা গেলেন। পরেঃ —

"শয়ন মন্দিরে, গৌরাঙ্গ সুন্দর,
উঠিল রজনী শেষে ।
মনে দৃঢ় আশ, করিব সন্ন্যাস,
ঘুচাব এ সব বেশে ॥
ঐছন ভাবিয়া, মন্দির তেজিয়া,
আইলা সুরধনী তীরে ।
দুই কর যুড়ি, নমস্কার করি,
পরশ করিল নীরে ॥
গঙ্গা পরিহরি, নবদ্বীপ ছাড়ি,
কাঞ্চন নগর পথে ।
করিলা গমন, শুনি সব জন,
বজ্র পড়িল মাথে ॥

পাষাণ সমান, হৃদয় কঠিন,
সেও শুনি গলি যায় ।
পশু পাখি ঝুরে, গলয়ে পাথরে,
এ দাস লোচনে গায় ।"

শ্রীগৌরাঙ্গ মন্দির ত্যাগ করিলে, তাহার একটু পরে, বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী জাগিয়া উঠিলেন । জাগিয়া উঠিয়া কি করিলেন তাহা ঠাকুর লোচন দাস এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেনঃ—

এথা বিষ্ণুপ্রিয়া, চমকি উঠিয়া,
পালঙ্কে বুলায় হাত ।
প্রভু না দেখিয়া, উঠিল কান্দিয়া,
শিরে মারে করাঘাত ।
মুই অভাগিনী, সকল রজনী,
জাগিল প্রভুরে লইয়া ।
প্রেমেতে বান্ধিয়া, মোরে নিদ্রা দিয়া,
প্রভু গেল পলাইয়া ॥
কাঞ্চন নগর, গেলা বিশ্বম্ভর,
জীব উদ্ধারিবার তরে ।
এদাস লোচন, দগধহে মন,
শচী না পাইল দেখিবারে ॥"

বিষ্ণুপ্রিয়া পালঙ্কে হাত দিয়া প্রভুকে না পাইয়া কান্দিয়া উঠিলেন, তাহার কারণ এই, প্রভু সন্ন্যাসে যাইবেন সকলে জানিতেন । তবে কবে যাইবেন তাহা প্রায় কেহই জানিতেন না । প্রভুকে না দেখিয়াই বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী প্রাণ উড়িয়া গেল । তিনি বুঝিলেন প্রভু পালাইয়াছেন । তখন উঠিয়া তিনি কি করিলেন তাহা বাসুদেব ঘোষ নিম্নোক্ত হৃদয়বিদীর্ণকারী পদে বর্ণনা করিয়াছেন । শচী দেবী অন্য ঘরে শয়ন করিয়া ছিলেন । বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী সেই ঘরে ব্যস্ত হইয়া

গেলেন । এখন পদ শুনুন :—

"শচীর মন্দিরে আসি, দুয়ারের পাশে বসি,
ধীরে ধীরে কহে বিষ্ণুপ্রিয়া ।
শয়ন মন্দিরে ছিল, নিশা ভাগে কোথা গেল,
মোর মুণ্ডে বজর পাড়িয়া ॥
গৌরাঙ্গ জাগয়ে মনে, নিদ্রা নাই দুনয়নে,
শুনিয়া উঠিল শচীমাতা ।
আলুথালু কেশে ধায়, বসন না রয় গায়,
শুনিয়া বধূর মুখের কথা ॥
ত্বরিতে জ্বালিয়া বাতি, দেখিলেন ইতি উতি,
কোন ঠাঁই উদ্দেশ না পাইয়া ।
বিষ্ণুপ্রিয়া বধূ সাথে, কান্দিতে কান্দিতে পথে,
ডাকে শচী নিমাঞি বলিয়া ॥
শুনি নদিয়ার লোক, কান্দে উচ্চৈঃস্বরে শোক,
যারে তারে পুছেন বারতা ।
এক জন পথে যায়, দশ জন পুছে তায়,
গৌরাঙ্গ দেখছ যাইতে কোথা ॥
সে বলে দেখেছি পথে, কেহত নাহিক সাথে,
কাঞ্চন নগর পথে ধায় ।
কহে বাসু ঘোষ ভাষা, শচীর এমন দশা,
পাছে জানি মস্তক মুড়ায় ॥'

তখন অল্প রাত্রি আছে । বাটীর ভিতরে প্রভুর উদ্দেশ না পাইয়া শচী বাহিরে আইলেন । বধূকে রাত্রে কাহার কাছে রাখিয়া আসিবেন, কাজেই সঙ্গে করিয়া বাহিরে আইলেন । শচী প্রদীপ হস্তে অগ্রে, ও বালিকা বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী শাশুড়ির অঞ্চল ধরিয়া পাছে ২ পথে হাঁটিয়া চলিলেন । আর শচী আই চিৎকার করিয়া 'নিমাই' 'নিমাই বলিয়া

ডাকিতে লাগিলেন। কিন্তু কোথায় নিমাই, যে তিনি উত্তর দিবেন? তখন তিনি সন্তরণ দিয়া গঙ্গা পার হইয়াছেন! এদিকে প্রভাত হইল, তখন শচী বধূকে লইয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

নদিয়ার ভক্তগণ প্রত্যহ প্রত্যূষে গঙ্গা স্নান করিয়া প্রভুর বাড়ীতে প্রভুকে দর্শন করিতে আসিতেন। সে দিনও সেইরূপ দেখিতে আইলেন। সেই চিত্রটী ঠাকুর বাসুদেব কিরূপ বর্ণনা করিয়াছেন শুনিতে আজ্ঞা হউক :—

"সকল মহান্ত মেলি, সকালে সিনান করি,
আইল গৌরাঙ্গ দেখিবারে।
গৌরাঙ্গ গিয়াছে ছাড়ি, বিষ্ণুপ্রিয়া আছে পড়ি,
শচী কান্দে বাহির দুয়ারে॥
শচী কহে শুন মোর নিতাই গুণ মণি।
কেবা আসি দিল মন্ত্র, কে শিখাইলে কোন তন্ত্র,
কিবা হইল কিছুই না জানি॥
গৃহ মাঝে শুয়ে ছিনু, ভাল মন্দ না জানিনু,
কিবা করি গেলরে ছাড়িয়া।
কেবা নিঠুরাই কৈল, পাঁথারে ভাসাঞা গেল,
রহিব কাহার মুখ চাঞা॥
বাসুদেব ঘোষ ভাষা, শচীর এমন দশা,
মরা হেন রহিল পড়িয়া।
শিরে করাঘাত মারি, ঈশান দেখায় ঠারি,
গোরা গেল নদীয়া ছাড়িয়া॥"

ঈশান শচী দেবীকে মাতার ন্যায় সেবা করিতেন। শচী স্তব্ধ হইয়া দুয়ারে বসিয়া আছেন। সকল মহান্ত দাঁড়াইয়া। জগজ্জননী শচী নিমাই ছাড়িয়া গিয়াছে একথা মুখে বলিতে পারিতেছেন না। সংকেত দ্বারা ঈশানকে তাহাই দেখাইতেছেন। এ বর্ণনাটী দেখিলে স্পষ্ট বোধ হয় যে বাসুদেব সেখানে উপস্থিত ছিলেন।

শ্রীগৌরাঙ্গ যে সে দিবস যাইবেন তাহা নিত্যানন্দ প্রভু জানিতেন। তিনি কোথা যাইবেন তাহাও জানিতেন। তবে সে কথা তিনি শচী দেবীকে প্রকাশ করেন না। প্রভুর বাড়ী গিয়া প্রভু চলিয়া গিয়াছেন জানিয়া ঐ পথে কাঞ্চন নগরে ধাইলেন।

তখন নগরে ধ্বনি হইল যে নিমাই পণ্ডিত সন্ন্যাস করিতে গৃহ ত্যাগ করিয়াছেন, আর নগরে কি শত্রু কি মিত্র সকলে হাহাকার করিতে লাগিল। সে হাহাকার অদ্যাবধি রহিয়াছে। সেই কথা মনন করিয়া অদ্যাপি তাঁহার ভক্তগণের হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া থাকে।

এক জন নব্য ভক্ত।

সারজর্জ বার্ডউড, একজন বিখ্যাত ইংরাজ। ইনি দীর্ঘকাল ভারতবর্ষে অবস্থিতি করেন। ভারতবর্ষে অবস্থিতি কালে তাহার এ দেশের অনেক প্রধান লোকের সঙ্গে পরিচয় ও আত্মীয়তা হয়। যে সমুদয় পদস্থ ভারতবাসীদিগের সঙ্গে তাঁহার পরিচয় ও আত্মীয়তা হয়, তিনি তাঁহাদের মধ্যে কাহার কাহার জীবন চরিত প্রকাশ করিয়াছেন। নিম্নে আমরা তাঁহার ইংরাজি পুস্তক হইতে ইহার একটী জীবন চরিতের অনুবাদ প্রকাশ করিলাম।

"ইংরাজ ও অপর ইউরোপীয়গণ হিন্দুদিগকে পৌত্তলিক বলিয়া ঘৃণা করেন। আমি পৌত্তলিকতা লইয়া তর্ক বিতর্ক করিব না। ইহা করার প্রয়োজন হইবে না। আমি নিম্নে যে জীবন চরিতটি প্রকাশ করিতেছি, এবং আমার বোম্বাই অবস্থিতি কালে এসম্বন্ধে আমি যাহা দর্শন করিয়াছি, পৌত্তলিকার প্রতি আমার মনের কিরূপ ভাব তাহা

ইহা দ্বারা প্রকাশিত হইবে।

"অনারেবেল জগন্নাথ জি শঙ্করসেট বোম্বায়ের একজন গোঁড়া হিন্দু ছিলেন। ইঁহার বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রতি অবিচলিত বিশ্বাস ছিল, এবং কোন অনুরোধেই তিনি হিন্দু ধর্ম্মের বিরুদ্ধাচরণ করিতেন না। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে কোন এক বিষয়ে আমা কর্ত্তৃক তিনি উপকৃত হন। এই জন্যে আমার উপর তাঁহার অটল বিশ্বাস ছিল। আমিও তাঁহার মঙ্গলের জন্যে যেরূপ যত্ন করিয়াছি, বোধ হয় আর কোন মনুষ্যের জন্যে ইহা করি নাই। তাঁহার প্রতি যত ভাল বাসা ও ভক্তি দেখাইয়াছি, বোধ হয় আর কাহার প্রতি এরূপ দেখাই নাই।

"আমার সঙ্গে তাহার এইরূপ আত্মীয়তা ছিল যে, যে সময় তিনি পূজা করিতেন তখনও তিনি আমাকে পূজার স্থানে যাইতে দিতেন। তবে যেখানে তিনি পূজা করিতেন সেখানে আমি যাইতে পারিতাম না। পূজার গৃহের বাহিরে বসিয়া আমি তাঁহার অর্চ্চনা দর্শন করিতাম। পূজার সময় তাঁহার পরিধান বস্ত্র ভিন্ন অঙ্গে আর কোন বস্ত্র থাকিত না। তিনি এই অবস্থায় হিন্দু দেবতার প্রতিমূর্ত্তি সম্মুখে রাখিয়া পূজা করিতেন। পারিবারিক পুরোহিত ব্রাহ্মণ সন্নিকটে উপবিষ্ট থাকিতেন। যে দিন পূজার সময় আমি গমন করিতাম, সে দিন আমাকে সম্মুখে বসাইয়া যেরূপ পূজা করিতেন আমাকে উহার মর্ম্ম সেইরূপ বুঝাইয়া দিতেন।

"একটি পৌত্রের মুখ দর্শন করিয়া মৃত্যু হয় তাঁহার জীবনের এটি প্রধান সাধ ছিল। তাঁহার একমাত্র পুত্র ছিল। এই পুত্রের যে সমুদয় সন্তান হইত সকলই কন্যা, এবং ইহার পুত্র সন্তান হওয়ার আশা হইতে তিনি প্রায় নৈরাশ হন। পৌত্রের মুখ দর্শনের জন্যে বোম্বাই অঞ্চলে যত তীর্থ স্থান আছে, তিনি সকল স্থানেই পর্য্যটন করেন, এবং আমি শুনিয়াছি যে, ইহার জন্যে তিনি কাশী, মথুরা, হরিদ্বার প্রভৃতি স্থানেও গমন করেন। যখন আমার সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ

হইত, তখনই তিনি এই পৌত্রের কথা উত্থাপন করিতেন।

"আমি মাথোরাণ নামক একটি পার্ব্বতীয় স্থানে গমন করিয়া শুনিলাম একটি নির্দ্দিষ্ট স্থানে কতক গুলি অসভ্য জাতি অসভ্য প্রণালীতে কি উৎসব করিবে। ইহা দেখিবার জন্যে আমার কৌতুক হয়। যে স্থানে এই উৎসবের অনুষ্ঠান হয়, তাহার চারিপাশে প্রস্তরের একটী প্রাচীর ছিল। আমি এই প্রাচীরের পার্শে জঙ্গলের মধ্যে থাকিয়া উৎসব দর্শন করিতে লাগিলাম। দেখি যে, কতক গুলি অতি দরিদ্র ও জঘন্য আকৃতি বিশিষ্ট লোক সেখানে একত্রিত হইয়াছে। এবং তাহারা সিন্দুরাবৃত একটি প্রস্তর পূজা করিতেছে। এই সময় আমার বোধ হইল আমি যে দিকে বসিয়া আছি, তাহার বিপরীত দিক হইতে যেন কোন ব্যক্তি উৎসবের স্থানে আগমন করিতেছে। আমি তাকাইয়া দেখি যে সেই ব্যক্তি আমার বন্ধু অনারেবল জগন্নাথ জি শঙ্কর সেট এবং তাঁহার সঙ্গে দুই জন শোয়ার। আমার প্রথম বোধ হইল যে, তিনি কৌতুক দেখিতে তথায় উপস্থিত হইয়াছেন। ইহা ভাবিয়া আমি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইবার উদ্যোগ করিতেছি, ইতিমধ্যে তাঁহার শোয়ারেরা আসিয়া তাঁহার অশ্ব ধারণ করিল এবং তিনি অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া সেই অপবিত্র পূজার স্থলে উপস্থিত হইলেন।

"অনারেবল জগন্নাথ জি শঙ্কর সেটের আকৃতি আর্য্যজাতির আদর্শস্বরূপ ছিল। সাগর্ব্ব ভাবে তিনি সেই স্থানে দণ্ডায়মান হইলেন। তাঁহার সুন্দর পরিচ্ছদ ও শিরোভূষণ, সুন্দর দীর্ঘ অবয়ব, তাহার উপর আবার বৃহৎ বৃহৎ শাখা নিঃসৃত অস্তমিত সূর্য্য কীরণ তাহার মুখমণ্ডলে পড়িয়াছে, ইহাতে তখন তাঁহার আশ্চর্য্য শোভা হইয়াছিল। আমি তাঁহার এই সাগর্ব্ব সুন্দরমূর্ত্তি দর্শন করিতে লাগিলাম। ইতিমধ্যে তিনি করজোড় করিয়া ঊর্দ্ধ মুখে ও ব্যাকুলিত নয়নে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। তাঁহার সুপ্রশস্ত ও ব্যাকুলিত বদন বহিয়া

অশ্রুধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল। গোপন ভাবে তাঁহার এই অপূর্ব্ব অর্চ্চনা দেখা আমার নিকট অন্যায় বলিয়া বোধ হইল, এবং আমি অতি গোপনে ও ধীরে ধীরে বাজারের দিকে প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম।

"একটু পরেই, তখনও আমি আমার বাসস্থান পর্য্যন্ত গমন করিতে পারি নাই, অশ্বের পদ শব্দ আমার কর্ণে প্রবেশ করিল। এই শব্দ শুনিতে শুনিতে বোধ হইল যেন পশ্চাদ্‌দিক হইতে কে আমাকে ডাকিতেছে এবং আমি মুখ ফিরাইয়া দেখিতে না দেখিতে অনারেবেল জগন্নাথ জি শঙ্কর সেট দুইজন শোয়ার সঙ্গে আমার নিকট উপস্থিত হইলেন। তাঁহার মুখ মণ্ডলে আনন্দচিহ্ন সমুদয় ডগমগ করিতেছে।

তাঁহার মুখ মণ্ডল দেখিয়া আমি বলিয়া উঠিলাম "তুমি তবে পৌত্র সম্বন্ধে দৃঢ় আশ্বাস প্রাপ্ত হইয়াছ?"

"হ্যাঁ" বলিয়া উত্তর দিয়া শঙ্কর সেট বলিলেন, "বার্ডউড, আমি তোমাকে সেই কথাই বলিতে আসিয়াছি।"

তাঁহাকে আর কিছু বলিতে না দিয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "তোমার যে পৌত্র হইবে, উহার অকাট্য প্রমাণ কি তুমি পাইয়াছ?"

"অকাট্য প্রমাণ, সে কি? স্বয়ং ভগবান আসিয়া আমাকে ইহা বলিয়া গেলেন!" আবেগপূর্ণ চিত্তে শঙ্কর এই উত্তর দিলেন।

"আমি তাহার এই উত্তর শুনিয়া অবাক হইলাম। আমি গোপনে তাঁহাকে যে পাথর খানি পূজা করিতে দেখিয়া ছিলাম, তাহার পর এই উত্তর শুনিয়া আর কি উত্তর দিব? আমার মুখ দিয়া আর কোন কথা সরিল না, আমি চুপ করিয়া রহিলাম। শঙ্কর সেট প্রফুল্লিত বালকের ন্যায় নানা কথা বলিতে লাগিলেন।"

আশ্চর্যের বিষয় এইযে, যে দিন এই কথা হয়, তাহার নয় মাস পর তাঁহার একটি পৌত্র জন্মে। জগন্নাথ জি শঙ্কর সেটকে পৌত্র কামনা রূপ অবিদ্যায় ঘিরিয়াছিল। ইহা হইতে মুক্ত হইবার জন্য তিনি নানারূপ দেবার্চ্চনা, নানা তীর্থ দর্শন করেন। পৌত্রের জন্ম হইল, আর তাহাকে এই

অবিদ্যা পরিত্যাগ করিল। পৌত্রের জন্ম হওয়া মাত্র তাহার মনের প্রকৃতির পরিবর্ত্তন হইল, তিনি অন্য আর একরূপ মনুষ্য হইলেন।

জগন্নাথ জি শঙ্কর সেটের অসাধারণ ক্ষমতা ছিল। তিনি অসাধারণ গুণসম্পন্ন ছিলেন। তাঁহার অভিমান ও উচ্চ অভিলাসের কথা তিনি কাহাকে গোপন করিতেন না। বোম্বায়ের হিন্দু সমাজের উপর কেবল তাঁহার আধিপত্য ছিলনা, জেমস সেটজি জিজি ভায়ের মৃত্যুর পর বোম্বাইবাসী সকলে তাহাকে কর্ত্তা বলিয়া মান্য করিতেন। কিন্তু যে পৌত্র জন্মিল, আর তিনি ঐহিকের সকল সুখ সম্পদ ভুলিয়া গেলেন, এবং মৃত্যুকে সম্মুখে জানিয়া, দৃঢ় সংকল্পের সঙ্গে প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। তাঁহার জীবনের প্রতি এইরূপ ঔদাস্য দেখিয়া বার্ডউড সাহেব তাহাকে বুঝাইবার যত্ন করিতেন। কিন্তু তিনি বার্ডউড সাহেবকে বলিতেন, "বার্ডউড, মৃত্যু কষ্টের বিষয় নহে, সুখের বিষয়, মৃত্যুর পথ বঙ্কিম নহে, সরল; একবার উপরে উঠিতে কি একবার নিম্নে নামিতে হয়না কিন্তু এক দিকেই গমন করিতে হয়, এবং যাহার হৃদয়ে কোন শঙ্কা নাই সে চোক বুজিয়া এই পথে গমন করিতে পারে"। তাঁহার নিকট মৃত্যু কষ্টকর বিষয় ছিলনা, কারণ তিনি ভগবানের নিকট যে মুক্তির প্রার্থনা করেন তাহা তিনি প্রাপ্ত হন। এই জন্যে আনন্দ অন্তরে মৃত্যু মুখে তিনি গমন করিবার উদ্যোগ করেন। কিছু দিনের মধ্যে তাঁহার মৃত্যু হয়। বার্ডউড সাহেব এই মহাত্মার জীবন চরিত এইরূপে সমাপ্ত করিয়াছেন।

"আমি উপরে যে মহাত্মার বিষয় বর্ণন করিলাম এরূপ কোন ব্যক্তি সম্বন্ধে কোন অনুসন্ধান না লওয়া, এরূপ ব্যক্তির প্রতি ভক্তি কি ভাল বাসা না দেখান, বোধ হয় কাহার পক্ষে সম্ভব নহে। জগন্নাথ জি শঙ্কর সেট আমাকে বলেন অকাট্য প্রমাণ, সেকি? ভগবান স্বয়ং আসিয়া আমাকে ইহা বলিয়া গেলেন। আবার কখন, একটি ঘৃণের পূজা স্থানে ভগবানের নিকট প্রার্থনার পর! এবং আমি যে

দিন তাঁহার মুখে এই কথাটি শ্রবণ করি সেই দিন হইতে হিন্দু পৌত্তলিকতা সম্বন্ধে আমার মতের পরিবর্ত্তন হয়। সেই দিন হইতে আমার বিশ্বাস হয় যে, ভগবান এক জনই আছেন, উপাসনা প্রণালী ও উপাসক ভেদে তিনি ভিন্ন ভিন্ন নামে ঐরূপ প্রকাশ হইয়া থাকেন।”

ফাল্গুনী পূর্ণিমা।

চৌদ্দ শত সাত শকে, অর্থাৎ ঠিক চারি শত চারি বৎসর পূর্ব্বে, শ্রীগৌরাঙ্গ দেব শ্রীধাম নদিয়া নগরীতে অবতীর্ণ হন। ফাল্গুণ মাসে, পৌর্ণমাসির সন্ধ্যাকালে তিনি জন্ম গ্রহণ করেন। ত্রয়োদশ মাস তিনি শ্রীশচী দেবীর গর্ত্তে অধিষ্ঠিত থাকেন, এবং ইহাতে তাঁহার পিতা শ্রীজগন্নাথ মিশ্র ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। কিন্তু শচীদেবীর পিতা প্রসিদ্ধ জ্যোতির্ব্বিদ ছিলেন। তিনি গনণা করিয়া কহিলেন যে, তাঁহার ব্যস্ত হইবার কোন কারণ নাই, কারণ শুভক্ষণে শুভলগ্নে এক মহাপুরুষ তাঁহার পুত্ররূপে ভূমিষ্ঠ হইবেন। এবং প্রকৃতই যে সময় গৌরাঙ্গদেব ভূমিষ্ঠ হইলেন, সে সময় নানাবিধ সুলক্ষণ উপস্থিত হইল। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে ঘটনাটি এইরূপে বর্ণিত আছে ঃ—

“চৌদ্দ শত সাত শকে মাস ফালগুণ।
পৌর্ণমাসীর সন্ধ্যাকালে হইল শুভক্ষণ॥
সিংহরাশি সিংহ লগ্ন উচ্চ গ্রহগণ।
ষড়বর্গ অষ্টবর্গ সর্ব্ব শুভক্ষণ॥
অকলঙ্ক গৌরচন্দ্র দিলা দরশন।
সকলঙ্ক চন্দ্রে আর কিবা প্রয়োজন॥
এত জানি চন্দ্রে রাহু করিলা গ্রহণ।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরি নাম ভাসে ত্রিভুবন॥

জগত ভরিয়া লোকে বলে হরি হরি।
সেই ক্ষণে গৌরচন্দ্র ভুমি অবতরি॥”

শ্রীচৈতন্য ভাগবতে এই ঘটনাটি আরো বিস্তীর্ণরূপে বর্ণিত হইয়াছেঃ—

“শচী গর্ত্তে বসে সর্ব্ব ভুবনের বাস।
ফাল্গুনী পূর্ণিমা আসি হইল প্রকাশ॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে যত আছে সুমঙ্গল।
সেই পূর্ণিমায় আসি মিলিলা সকল॥
সংকীর্ত্তন সহিত প্রভুর অবতার।
গ্রহণের ছলে তাহা করেন প্রচার॥
ঈশ্বরের কর্ম্ম বুঝিবার শক্তি কার।
চন্দ্র আচ্ছাদিল রাহু ঈশ্বর ইচ্ছায়॥
সর্ব্ব নবদ্বীপে দেখে হইল গ্রহণ।
উঠিল মঙ্গল ধ্বনি শ্রীহরি কীর্ত্তন॥
অনন্ত অর্ব্বুদ লোক গঙ্গাস্নানে যায়।
হরিবোল হরিবোল বলি সবে ধায়॥
হেন হরিধ্বনি হৈল সর্ব্ব নদীয়ায়।
ব্রহ্মাণ্ড পুরিয়া ধ্বনি স্থান নাহি পায়॥
অপূর্ব্ব শুনিয়া সব ভাগবত গণ।
সবে বলে নিরন্তর হউক গ্রহণ॥
সবে বলে আজি বড় বাসি এ উল্লাস।
হেন বুঝি কিবা কৃষ্ণ করিল প্রকাশ॥
গঙ্গাস্নানে চলিলা সকল ভক্তগণ।
নিরবধি চতুর্দ্দিকে হরি সংকীর্ত্তন॥
কিবা শিশু বৃদ্ধ নারী সজ্জন দুর্জ্জন।
সবে হরি হরি বলে দেখিয়া গ্রহণ॥
হরিবোল হরিবোল সবে এই শুনি।

সকল ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিলেক হরিধ্বনি
চতুর্দ্দিকে পুষ্পবৃষ্টি করে দেবগণ।
জয় শব্দে দুন্দভি বাজয়ে অনুক্ষণ ॥
হেনই সময়ে প্রভু জগত জীবন।
অবতীর্ণ হইলেন শ্রীশচী নন্দন ॥”

ফালগুনি পূর্ণিমা সন্ধ্যার সময় শ্রীগৌরাঙ্গ অবতীর্ণ হইলেন, সেই সময় চন্দ্র গ্রহণ হইল ও নদীয়ায় তাবত লোকে হরিবোল দিতে লাগিল। এইরূপে হরির নামের সহিত শ্রীগৌরাঙ্গ জগতে জন্ম লইলেন। যখন ভগবান ধরাতলে আইলেন তখন লোকের হরিধ্বনি করা উচিত, আর সকলেরই আনন্দ সাগরে নিমগ্ন হওয়া উচিত, কিন্তু শ্রীগৌরাঙ্গ গোপন ভাবে অবতীর্ণ হইলেন, সুতরাং তাঁহার অবতার বৃত্তান্ত কাহার জানিবার সম্ভাবনা ছিল না। এই নিমিত্ত গ্রহণের সময় ধরাতলে উদয় হইলেন।

আবার এমনি সময় উদয় হইলেন যে লোকের মনে স্বাভাবিক আনন্দ উদয় হয়। ফালগুনি পূর্ণিমা, তাহাতে সন্ধ্যাকাল, লক্ষ লক্ষ লোকে হরিধ্বনি করিতেছে, কাজেই স্বভাবতঃ সকলে আনন্দে মগ্ন।

শ্রীগৌরাঙ্গ পূর্ণ অবতার। একথা কেহ কেহ বিশ্বাস করেন না, কিন্তু যাঁহারা বিশ্বাস করেন, তাঁহাদের কি সুখের সীমা আছে?

সেই পূর্ণব্রহ্ম সনাতন জীবের মলিন দশা দেখিয়া, দয়ার্দ্রচিত্ত হইয়া, তাঁহার জীব গণের মঙ্গলের নিমিত্ত স্বয়ং আইলেন। তিনি জীবের মঙ্গলের নিমিত্ত এত ব্যগ্র যে কাহাকেও পাঠাইয়া তাঁহার বিশ্বাস হইল না, ও সেই নিমিত্ত তিনি আপনি আইলেন। যাঁহারা এইরূপ বিশ্বাস করেন, তাঁহাদের মত সুখী ত্রিজগতে আর কে?

গৌরভক্তগণ শ্রীগৌরাঙ্গের জন্ম লীলা একবার আস্বাদন করুনঃ জগজ্জননী শচী, পুত্রকে ক্রোড়ে করিয়া বসিয়া আছেন। আর পাড়ার রমণীগণ সকলে আসিয়া পুত্রের মুখ নিরীক্ষণ করিতেছেন। গোলকপতি নব-

প্রসুত শিশুর ভাণ করিয়া জননীর ক্রোড়ে শয়ন করিয়া আছেন। শচী সলজ্জ ভাবে পুলকিত মনে সন্তানের মুখ নিরীক্ষণ করিতেছেন। মিশ্র ঠাকুর অত্যন্ত ব্যস্ত, নগরবাসীগণ যাঁহারা আসিতেছেন সকলকে অভ্যর্থনা করিতেছেন। আর কি বালক কি বৃদ্ধ আনন্দে সকল-কেই আলিঙ্গন করিতেছেন।

এ দিকে অন্তরীক্ষে সমস্ত দেবগণ আগমন করিয়াছেন। সর্ব্বাগ্রে স্বয়ং ভগবতী ধান্য দুর্ব্বা দিয়া শ্রীগৌরাঙ্গকে আশীর্ব্বাদ করিতেছেন। আর ঘন ২ সন্তানের মুখ চুম্বন করিতেছেন। দেবগণ ভগবানের করুণা দেখিয়া ভক্তিতে ও প্রেমেতে আর্দ্র হইয়া শিশুরূপ ভগবানের মুখ নিরীক্ষণ করিতেছেন। স্বয়ং শেষ অন্তরীক্ষে সহস্র ফণারূপ ছত্র ধরিয়া আছেন। ব্রহ্মা ও মহেশ্বর স্তব করিতেছেন। স্বয়ং বীণা-পাণি বীণা হস্তে করিয়া এই গানটি গাইতেছেন।

“আর ভয় নাই ভয় নাই আঁধার গেল,
নবদ্বীপ চাঁদের উদয় হইল।”

প্রভু যে ভূমিষ্ট হইলেন অমনি অদ্বৈত, হরিদাস, প্রভৃতি প্রধান ২ ভক্তগণ জানিতে পারিলেন যে, গোলকপতি গোলক ছাড়িয়া ধরা-তলে অবতীর্ণ হইয়াছেন। আনন্দে বিহ্বল হইয়া তাঁহারা নৃত্য করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের তৎকালীন অবস্থা শ্রীচৈতন্যামৃত গ্রন্থে এইরূপ বর্ণিত হইয়াছেঃ—

“নদীয়া উদয় গিরি, পূর্ণচন্দ্র গৌরহরি,
কৃপাকরি হইল উদয়।
পাপতমো হৈল নাশ, ত্রিজগতে উল্লাস,
জগভরি হরিধ্বনি হয় ॥
সেইকালে নিজালয়, উঠিয়া অদ্বৈত রায়,
নৃত্য করে আনন্দিত মনে।
হরিদাস লঞা সঙ্গে, হুঙ্কার কীর্ত্তন রঙ্গে,
কেনে নাচে কেহ নাহি জানে ॥”

শচী দেবীর পিতা নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী দৌহিত্রের মুখ দর্শন করিতে আইলেন। তিনি পূর্ব্বেই গণনা করিয়া জানিতে পারিয়াছিলেন যে, কোন মহাত্মা তাঁহার কন্যার গর্ব্ভে প্রবেশ করিয়াছেন। তিনি দৌহিত্রের মুখ দর্শন করিয়া স্পন্দহীন হইয়া রহিলেন এবং অদ্ভুত লক্ষণ সমস্ত দেখিতে লাগিলেন। কিন্তু নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী নবপ্রসুত বালকের মাহত্যের সীমা করিয়া উঠিতে পারিলেন না। তিনি এই মাত্র বুঝিতে পারিলেন যে, ইনি রাজাধিরাজ মহারাজ অপেক্ষাও বড় এবং বিদ্যা বুদ্ধিতে বৃহস্পতি অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ হইবেন। এই সময় এক গণক ব্রাহ্মণ হঠাৎ উপস্থিত হইয়া যাহা নিদ্ধারণ করিয়াছিলেন তাহা বৃন্দাবন দাস ঠাকুর এইরূপ বর্ণন করিয়াছেন ঃ—

"সেই খানে বিপ্ররূপে এক মহাজন।
প্রভুর ভবিষ্য কর্ম্ম করয়ে কথন॥
বিপ্র বলে এ শিশু সাক্ষাৎ নরায়ণ।
ইহা হৈতে সর্ব্ব ধর্ম্ম হইবে স্থাপন॥
ইহা হৈতে হইবেক অপূর্ব্ব প্রচার।
এ শিশু করিবে সর্ব্ব জগত উদ্ধার॥
ব্রহ্মা শিব শুক যাহা বাঞ্ছে অণুক্ষণ।
ইহা হৈতে তাহা পাইবেক সর্ব্বজন॥
সর্ব্বভূত দয়ালু নির্ব্বেদ দরশনে।
সর্ব্ব জগতের প্রীত হইবে ইহানে॥
অন্যের কি দায় বিষ্ণু দ্রোহী যে যবন॥
তাহারাও এ শিশুর ভজিবে চরণ॥"

বিপ্র গণনা করিয়া যাহা বলিয়া গিয়াছিলেন তাহা যে প্রতি অক্ষরে সুসম্পন্ন হইয়াছিল, ইহা গৌরভক্তগণ মাত্রে অবগত আছেন।

শ্রীগ্রন্থ পরিচয়।

শ্রীগৌরাঙ্গের লীলা আমরা কয়েক খানি গ্রন্থে জানিতে পাই।

প্রথমতঃ মুরারী গুপ্তের কড়চা। ইহার বাঙ্গলা অনুবাদ করিয়া শ্রীলোচন দাস ঠাকুর তাঁহার শ্রীচৈতন্যমঙ্গল করিয়াছেন। প্রভুর বাল্য লীলা এই গ্রন্থে বিশেষ বিস্তার আছে। কারণ ভাগ্যবান মুরারী মহাপ্রভুর বালককালের সঙ্গী ছিলেন।

তাহার পরে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর আদেশ ক্রমে শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুর শ্রীচৈতন্য ভাগবত গ্রন্থ প্রণয়ণ করেন। ইহাতে প্রভুর মধ্যমাবস্থার লীলা বিস্তৃতরূপে বর্ণিত হইয়াছে। মধ্য লীলায় মহাপ্রভুর প্রধান সঙ্গী নিত্যানন্দ প্রভু। তাঁহার মুখে শুনিয়া শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুর তাঁহার গ্রন্থ প্রণয়ণ করেন। বৈষ্ণবেরা শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুরকে ব্যাসাবতার বলিয়া থাকেন।

তাহার পরে শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী তাঁহার শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থ লিখেন। এ গ্রন্থ খানি প্রভুর শেষ কালের শেষ সঙ্গী শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর মুখে শুনিয়া শ্রীকবিরাজ গোস্বামী লিখেন। সুতরাং প্রভুর অন্ত্য লীলা ইহাতে বিস্তৃতরূপে বর্ণিত আছে।

লীলা সম্বন্ধে শ্রীকবি কর্ণপুর দুই খানি গ্রন্থ লিখেন, অর্থাৎ শ্রীচৈতন্য চরিত ও শ্রীচৈতন্য চন্দ্রোদয় নাটক। শেষোক্ত পুস্তক খানি এসিয়াটিক সোসাইটী দ্বারা মুদ্রিত হইয়াছে। আর প্রথম পুস্তক খানির কিয়দংশ, শ্রীযুক্ত রাম নারায়ণ বিদ্যারত্ন ছাপাইয়াছেন। এই গ্রন্থখানি দুষ্প্রাপ্য হইয়াছে। যদি কাহার কাছে থাকে কৃপা করিয়া লিখিবেন।

আবার স্বরূপ দামোদরের কড়্চার কথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শুনিতে পাওয়া যায়। কিন্তু সে গ্রন্থখানি কোথাও পাওয়া যাইতেছে না। কেহ বলেন সে গ্রন্থ আদৌ লিপিবদ্ধ হয় নাই। স্বরূপ রঘুনাথের কণ্ঠে উহা রাখিয়াছিলেন। কেহ বলেন গ্রন্থ আছে। যদি জীবের ভাগ্যে সে খানি থাকে তবে আমরা জানিতে পাইলে কৃতার্থ হইব। এক খানি কৃত্রিম স্বরূপের কড়চা বলিয়া প্রচার আছে, তাহা আমরা জানি।

রাম মোহন রায়।

পরমারাধ্য রাম মোহন রায় খ্রীষ্টিয় ধর্ম্মের প্রাধান্য দেখিয়া ব্রাহ্ম ধর্ম্মের সৃষ্টি করেন। ইহার নিমিত্ত তিনি বিস্তর দেশ ভ্রমণ ও ভাষা শিক্ষা ও শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। কিন্তু এত ক্লেশ না করিয়া তাঁহার বাড়ীর পার্শ্বে যে বৈষ্ণবদিগের বাড়ীতে চৈতন্য ভাগবত ও চৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থ ছিল, তাহা যদি একবার পাঠ করিতেন, তাহা হইলে আর তাঁহার তির্ব্বতে যাইতে হইত না, ও ব্রাহ্ম ধর্ম্মের সৃষ্টি করিতে হইত না। তিনি যত তত্ত্ব বিচার করিয়াছেন, তাহা সমুদয় বৈষ্ণব শাস্ত্রে আছে। আর ইহা ব্যতীত বৈষ্ণব শাস্ত্রে যাহা আছে, তাহা তাঁহার মনে কখন উদয়ও হয় নাই। তিনি মহাপুরুষ ছিলেন সন্দেহ নাই। বোধ হয় ঘৃণা করিয়া বৈষ্ণবদিগের গ্রন্থ পড়েন নাই। কিন্তু তিনি যে ব্রাহ্ম ধর্ম্ম স্থাপন করিয়া যান, তাহা বৈষ্ণব ধর্ম্মের খোসা লইয়া কোন ক্রমে প্রাণ ধারণ করিয়া আছে।

প্রার্থনা।

হে শ্রীগৌরাঙ্গ! আমাদের পরিবার বৃদ্ধি কর। তুমি নয়ন মেল ও তোমার জীবের দশা একবার দেখ। সমস্ত জীব উন্মত্ত হইয়া রহিয়াছে। ইউরোপীয় নাস্তিকতায় দেশ অন্ধকার হইয়াছে, কেবল কুকর্ম্ম ও কুবাসনায়, জীব ছারে খারে যাইতেছে। হে শ্রীগৌরাঙ্গ! এমন সময় তুমি যদি চক্ষু না মেলিবে, তবে আর কে কি করিবে? প্রভো! তুমি জীবকে তোমার পরিচয় দেও। তুমি পরিচয় না দিলে তাহারা কেমনে চিনিবে? তুমি যে চুপে চুপে নদিয়ায় একটী ব্রাহ্মণের ঘরে জন্ম লইবে, এ বিশ্বাস তুমি না দিলে কে বিশ্বাস করিবে? প্রভো! আমাদের পরিবার বৃদ্ধি কর। জীব মাত্রে তোমার লীলামৃত পান করুক। জীবমাত্রে তোমার শ্রীচরণে আশ্রয় লউক। জীবমাত্রে তুমি যে কি মধুর তাহা অবগত হউক।

শ্রীশ্রী

বিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকা।

পাক্ষিক পত্র।

১ম বর্ষ } শ্রীশ্রীচৈতন্যাব্দ ৪০৫। ১৫ ই চৈত্র। { ২য় সংখ্যা।

পণ্ডিত শ্রীপ্রভু রাধিকা নাথ গোস্বামী
ও
ভক্তি বিনোদ শ্রীযুক্ত কেদার নাথ দত্ত কর্ত্তৃক
সম্পাদিত।

—○○○—

কলিকাতা।
বাগবাজার ২নং আনন্দ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের গলি
স্মিথ এণ্ড কোম্পানির যন্ত্রে
শ্রীকেশব লাল রায় দ্বারা
মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বার্ষিক মূল্য ২৲ প্রতি খণ্ড ৵

শ্রীশ্রী

বিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকা।

শ্রীধাম নবদ্বীপ দর্শন।

আমি তখন ছোট, ইংরাজি পড়িতেছি, পড়া প্রায় সাঙ্গ হইয়াছে। আমার একবার নবদ্বীপ দেখিবার সাধ হইল, কেন হইল বলিতেছি। আমি মহাপ্রভুর নাম তখন শুনিয়াছিলাম। কিছু কিছু চরিতামৃত ও চৈতন্য ভাগবত পড়িয়াছিলাম। তাহাতে আমার মন মহাপ্রভুর প্রতি অত্যন্ত আকর্ষিত হয়। এত আকর্ষিত হয় যে নাম মনে হইলেই আনন্দ হইত।

কতক গুলি হরি সংকীর্ত্তনও জানিতাম। সে সমুদয় গান করিলে আমার মনে নানা ভাব হইত। ভাবিতাম মহাপ্রভুর ভক্তগণ খোল করতাল লইয়া পায় নুপুর দিয়া নগরে নগরে গ্রামে গ্রামে হরিনাম বিলাইয়া বেড়াইতেন। এই সব ভাব মনে হওয়াতে আমার অত্যন্ত আনন্দ হইত, আর ইচ্ছা করিত যে সংসারে জলাঞ্জলি দিয়া যেমন,

অক্রোধ পরমানন্দ নিত্যানন্দ রায়।
অভিমান শূন্য নিতাই নগরে বেড়ায়॥

সেইরূপ করিয়া আমি নগরে নগরে বেড়াইব।

আমার নদিয়ায় যাওয়ার সাধ হয় তাহার বিশেষ উদ্দেশ্য মহাপ্রভুর বাড়ী দেখিব, শ্রীবাসের আঙ্গিনা দেখিব, আর শ্রীগৌরাঙ্গের প্রেমমগ্ন ভক্তগণ দর্শন করিব। আমার মনে বিশ্বাস ছিল যে, নদীয়াতে প্রভুর বাড়ীও আছে, শ্রীবাসের আঙ্গিনাও আছে। আর নদিয়া সম্বন্ধে আমার এইরূপ বিশ্বাস ছিল যে, সেখানে লোকে দিবা নিশি হরির নামে

উন্মত্ত, ও নবদ্বীপে হরির নাম সংকীর্ত্তন ব্যতীত লোকের আর কোন কাজ কর্ম্ম নাই। তখন আমি জানিতাম না যে সে নদেও নাই, সে ভক্তও নাই।

সে যাহা হউক, রাসের পূর্ব্ব রাত্রে গোয়াড়ি হইতে সন্ধ্যার পর নৌকায় যাত্রা করিলাম। নৌকায় প্রবেশ করিয়াই নিদ্রা গেলাম, আর কিছু জানিনা। প্রভাতে নাবিকগণ আমাকে ডাকিয়া জানাইল যে নদের ঘাটে নৌকা আসিয়াছে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, নদের কোন্ ঘাটে? আমার মনের ভাব এই যে সেটী মহাপ্রভুর ঘাট কি না। নাবিকেরা কোন উত্তর দিল না। তখন ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া গাত্রে ভদ্র লোকোপযোগী বস্ত্র দিয়া বাহির হইলাম। পরে গঙ্গা তীরে অবতীর্ণ হইয়া ভাবিলাম এ পুণ্য ক্ষেত্র, ইহাকে প্রণাম করা কর্ত্তব্য। এই বলিয়া নদীয়া মুখ হইয়া প্রণাম করিলাম।

তখন আমার মনে উদয় হইতে লাগিল যে এই সেই নদীয়া, যেখানে মহাপ্রভুর বাড়ী ও যেখানে শ্রীবাসের আঙ্গিনা। অমনি হৃদয় দ্রবীভূত হইল। আবার, প্রণাম করিবার সময় মনে হইল যে, এই নদীয়ার কর্ত্তা একটি সুন্দর বামুনের ছেলে। ইহা মনে যত ভাবি ততই তরঙ্গ উঠির্তে লাগিল। তখন উঠিয়া দাঁড়াইয়া আমি ফুকরিয়া কান্দিতে লাগিলাম। আমি ভাবিলাম যে, ভুমির মাহাত্ম্য দেখ। আমি কখন ভক্তিপূর্ব্বক মুখে হরিনাম করি নাই। কিন্তু এই পুণ্য ভূমি দর্শন করা মাত্র আমার অঙ্গ এলাইয়া পড়িল!

ঘাটে দেখিলাম অনেক লোক, আর লজ্জা ক্রমে চাদর দিয়া মুখ ঝাপিলাম। আমার মনে বিশ্বাস, যে নদীয়া কেবল ভক্তময়, আর সেখানে লোকের সংকীর্ত্তন ও হরি কথা ব্যতীত আর কোন কাজ নাই। আমার মন তখন এরূপ কোমল হইয়াছে, যে জীব মাত্রকে আমার আলিঙ্গন করিতে ইচ্ছা করিতেছে। অতএব ভাবিতেছি, যে নদেবাসী যাহাকে দেখিব তাহাকে প্রণাম করিব, আর তাঁর গলা ধরিয়া আমিও কান্দিব, তিনিও কান্দিবেন। আর তাঁহাকে বলিব যে তুমি প্রভু, তুমি নদেবাসী, তুমি প্রভুর নিজ গ্রামস্থ, তুমি অনায়াসে আমাকে প্রেম ভক্তি দান করিতে পার।

আমি তখন কতক গুলি শোক পাইয়াছি, মনে একটু উদাস ভাবও ছিল। ভাবিয়া ছিলাম যদি নদেবাসীগণের কৃপায় প্রেম ধন পাই তবে আর কি, নগরে নগরে

"বল ভাই হরিও রাম রাম হরিও" গাইয়া, পাগলা নিতাইর ন্যায় বেড়াইব। আমি মুখ আচ্ছাদন করিয়া চলিলাম, আর আমার প্রতি পদে পদ স্খলন হইতে লাগিল। যেমন গঙ্গার একটী ঢেউর উপরে আর একটী ঢেউ আসে, সেইরূপ আমার অন্তরে তরঙ্গের উপর তরঙ্গ আসিতে লাগিল। অন্তর শীতল হইল, আর জগত সুখময় বোধ হইতে লাগিল। আবার, "এই সে নদে, এই সে নদে" এইরূপ যখন মনে হইতে লাগিল তখন আনন্দে নৃত্য করিতে ইচ্ছা করিতে লাগিল।

আমি তাহার বহুপূর্ব্বে মহাপ্রভুর একটী ছবি দেখিয়াছিলাম। মধ্যখানে মহাপ্রভু, আর দুই পার্শ্বে দুই প্রভু, অর্থাৎ শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীঅদ্বৈত। মহাপ্রভুর বয়ঃক্রম ২২ বৎসর আন্দাজ, মস্তক অবনত, আর সুদীর্ঘ কমল নয়ন দিয়া জল পড়িতেছে। সে চিত্রটী আমি শুভক্ষণে দেখিয়াছিলাম। তাহা দেখিয়া আমার প্রথম উদয় হইয়াছিল যে এই অল্পবয়স্ক যুবকটী মহাপ্রভু। ইহাকেই লোকে পূজা করে? এ ত সামান্য বালক নয়! কি অসীম শক্তিধর যুবক! আবার সেই সঙ্গে সঙ্গে মুখ খানি দেখিয়া প্রাণ আকর্ষিত হইতে লাগিল। যেন কত সরল, আর হৃদয়ে যেন কত ভাল বাসা! সে চিত্রটী অদ্যাপি আমার হৃদয়ে আছে। আমি যদিও মুখ ঢাকিয়া চলিতেছি, আর জলে নয়ন আবৃত, কিন্তু তখন আমি সেই রূপটী দেখিতে লাগিলাম, আর ধারার উপর ধারা আসিতে লাগিল। আর মনে মনে সেই রূপটীকে লক্ষ্য করিয়া

আমি বলিতে লাগিলাম "তুমি সেই মহাপ্রভু, তুমি নাচিয়াছিলে, আর অদ্যাপি তোমাকে লোকে পূজা করে?"

আবার ভাবিতেছি, আমি যেখানে দাঁড়ায়ে এখানে মহাপ্রভু বেড়াইতেন। কে জানে হয়ত এখানে তিনি নৃত্য করিয়াছিলেন। আমি ঘাটের উপর উঠিলাম, নয়ন জলে পথ দেখিতে পাইতেছি না। এমন সময় নদেবাসীর সহিত দেখা হইল। দুই জন আসিতেছে, আর কথা কহিতেছে। আমার সংকল্প ছিল যে নদেবাসী দেখিলেই তাহার চরণে পড়িব। ইহাদের পানে চাহিয়া ইতস্তত করিতে লাগিলাম। দেখিলাম ইহারা নদেবাসী হইয়াও ভগবৎ কথা কহিতেছে না। সমান্য জীবের ন্যায় সামান্য কথা কহিতে কহিতে যাইতেছে। প্রণাম করিতে সাহস হইল না, ভাবিলাম এরা বৈষ্ণব নহে। আর পূর্ব্বে শুনিয়াছিলাম যে নদেতে এখন মন্দ মানুষ প্রবেশ করিয়াছে, এরা তাহারাই হবে। পরে দেখি দুইটী বৈষ্ণব আসিতেছেন। দেখি তাঁহারাও সামান্য কথা কহিতেছেন, আর এক জন মহা উগ্র হইয়া কি ক্রয় বিক্রয়ের কথা বলিতেছেন। তাঁহারা প্রভুর কথাও কহিতেছেন না, আর তাহারা যে নদেবাসী ও মহাপ্রভুর গণ, তাহাও তখন তাহাদের মনে নাই।

তখন আমি কাঁকালি ভাঙ্গিয়া বসিয়া পড়িলাম। আর অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই।

শ্রীগৌরাঙ্গের গৃহত্যাগ।

গতবারে বলিয়াছি, যে প্রভাতে শ্রীগৌরাঙ্গের অদর্শনে তাঁহার বাড়ীতে সকলে রোদন ও হাহাকার করিতেছেন। শ্রীশচী বাহির দুয়ারে স্তব্ধ হইয়া বসিয়া আছেন, ও মহান্তেরা তাঁহাকে বেড়িয়া রহিয়াছেন। শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া বাড়ীর ভিতরে ভূমিতে পড়িয়া রোদন করিতেছেন। তবে সকলের মনে একটা আশা আছে। প্রভু

যে সন্ন্যাস করিতে গিয়াছেন ইহা ঠিক কেহ জানে না। সকলেরি কেবল অনুমান। যাঁহারা যাঁহারা জানিতেন তাঁহারা প্রভুর মুখে শুনিয়াছিলেন, আর প্রভুর আজ্ঞা ক্রমে তাহা গোপন রাখিয়াছিলেন। তাঁহারা প্রভুর গৃহত্যাগ জানিবা মাত্র কাটোয়া মুখে ধাইলেন। তাঁহারা কে কে ঠিক জানা যায় না। কিন্তু বোধ হয় তাঁহারা প্রভু নিত্যানন্দ, মুকুন্দ, চন্দ্র শেখর, ও প্রভুর নদিয়ার ভৃত্য গোবিন্দ। প্রভুর বাড়ীতে মহান্তগণ শচী দেবীকে নানামত সান্ত্বনা করিতেছেন, এবং সকলেই বলিতেছেন প্রভু কোথা গিয়াছেন? তিনি এখনই ফিরিয়া আসিবেন।

এদিকে প্রভু কাটোয়ায় পঁহুছিলেন, পঁহুছিয়াঃ—

"কাঞ্চন নগরে এক বৃক্ষ মনোহর।
সুরধনী তীরে ছায়া শীতল সুন্দর॥
তার তলে বসিলেন গৌরাঙ্গ সুন্দর।
কাঞ্চনের কান্তি যিনি দীপ্ত কলেবর॥
নগরের লোক ধায় যুবক যুবতী।
সতী ছাড়ে নিজপতি যপ ছাড়ে যতী॥
কেহ বলে এ নাগর যেই দেশে ছিল।
সে দেশে পুরুষ নারী কেমনে বাঁচিল॥
কেহ বলে নিজ নারীর গলে পদ দিয়া।
এসেছেন জননীর পরাণ বধিয়া॥
হেনকালে কেশব ভারতী মহামতি।
দেখিয়া তাঁহারে প্রভু করিল প্রণতি॥
কৃষ্ণদাস কর গোসাঞি দেহ ভক্তি বর।
বাসু ঘোষ কহে মুণ্ডে পড়িল বজর॥

প্রভু যখন উপস্থিত হইয়াছিলেন, তখন ভারতী স্নান করিতে গিয়াছিলেন। তাঁহার আগমন অপেক্ষা করিয়া প্রভুর পার্শদগণ তাঁহাকে পরিবেষ্টন করিয়া বসিয়া আছেন। সেই পথ দিয়া নগরবাসী ও নগর

বাসিনীগণ যাইতে যাইতে অমনি দাঁড়াইয়া গেলেন। দেখেন একটী সোনার মানুষ বসিয়া রোদন করিতেছেন, আর তাঁহার দুই দিকে উদাসিন্ বেশে নিত্যানন্দ ও মুকুন্দ বসিয়া আছেন। সম্মুখে চন্দ্র শেখর অতি কাতরস্বরে রোদন করিতেছেন। কাহার মুখে কোন বাক্য নাই। দর্শকেরা চকিতের ন্যায় প্রভুর শ্রীমুখ দর্শন করিতেছেন। আর নানারূপ অনুমান করিতেছেন। কিন্তু কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে সাহস হইতেছেনা। এমন সময় ভারতী আইলেন।

ভারতীকে দেখিয়া প্রভু প্রণাম করিলেন, ও করযোড়ে বলিতে লাগিলেন ঃ "তুমি পতিত পাবন, আমাকে সংসার বন্ধন হইতে মুক্ত কর। আর শ্রীকৃষ্ণ তোমার হৃদয়ে সর্ব্বদা বিরাজ করিতেছেন। তুমি আমার প্রতি শুভ দৃষ্টিপাত কর, যেন আমি কৃষ্ণ দাস হই।" ইহা বলিয়া প্রভু "হরিবোল" "হরিবোল" বলিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন, এবং মুকুন্দ প্রভৃতি গান গাইতে লাগিলেন। তখনই দর্শকেরা সকলে বুঝিলেন যে এই নবীন সোনার মানুষটী সন্ন্যাস করিতে আসিয়াছেন। ইহাতে কি পুরুষ কি নারী সকলের হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া গেল। ক্রমে ক্রমে সকলে শুনিলেন যে ইনি সেই নদীয়ার গৌরহরি, ও তিনি আপনার অতি নবীনা ঘরণী ও আপনার অতি বৃদ্ধা মাতাকে ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস করিতে আসিয়াছেন। ইহাতে সকলেই রোদন করিতে লাগিলেন।

এদিকে প্রভু "হরিবোল" বলিয়া নৃত্য করিতেছেন, আর চতুস্পার্শ্বস্থ লোক তাঁহার নয়ন জলে প্লাবিত হইতেছেন। ক্রমে সকলেই "হরিবোল" ধ্বনি করিতে লাগিলেন। কেহ কেহবা নৃত্য করিতেও লাগিলেন। কেহবা ধূলিতে গড়া গড়ি দিতে লাগিলেন, কেহ উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন, কেহবা মনোবেদনায় মূর্চ্ছা গেলেন। এই কলরবে কাটোয়ার নাগরিয়াগণ সেই স্থানে ধাইয়া আসিতে লাগিলেন, এবং যিনি আইলেন তিনি আর গৃহে ফিরিয়া যাইতে

পারিলেন না। ক্রমে ক্রমে একথা গ্রামে গ্রামে প্রকাশ হইতে লাগিল, আর বহু দূরস্থ গ্রাম সমস্ত হইতেও লোক ধাইয়া আসিতে লাগিলেন। এইরূপে অসংখ্য লোক একত্রিত হইলেন, এবং "হরিবোল" "হরিবোল" ধ্বনিতে সমস্ত নিশি অতিবাহিত করিলেন।

প্রভাতে প্রভু চন্দ্র শেখরকে বলিলেন "বাপ্! আমি তোমাকে প্রতিনিধি নিযুক্ত করিলাম। সন্ন্যাসের সমুদয় কার্য্য যাহা হয় তুমি কর।" এই আজ্ঞায় চন্দ্র শেখরের মনে কি হইল তাহা অনুমান কর। চন্দ্র শেখর প্রভুর সম্পর্কীয়। অল্প বয়সে প্রভুর পিতার বিয়োগ হইলে তাঁহার পিতার মত চন্দ্র শেখর আচার্য্য রত্ন প্রভুকে ভাল বাসিতেন। চন্দ্র শেখরকে প্রভু যখন এই আজ্ঞা করিলেন, তখন তিনি মাথা হেঁট করিয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, "এ আজ্ঞাটী আমাকে না করিয়া একেবারে শচী দেবীকে করিলেই ভাল হইত। ভুবনের মধ্যে প্রভু বুঝি এরূপ আজ্ঞা করিবার আর লোক পাইলেন না। আমি যাইয়া শচী দেবীকে ও বিষ্ণুপ্রিয়া বধূমাতাকে কিরূপে মুখ দেখাইব?' কিন্তু প্রভু যাহাকে যাহা আজ্ঞা করিতেন তাহাতে দ্বিরুক্তি করার কাহারও সাধ্য ছিল না। আচার্য্য রত্ন সুতরাং "যে আজ্ঞা" বলিলেন।

কিন্তু আচার্য্য রত্নের বড় পরিশ্রম করিতে হইল না। যাহার যেরূপ সাধ্য, লোকে সেইরূপ দ্রব্যাদি অপনা আপনিই আনিতে লাগিল। মস্তক মুণ্ডনের নিমিত্ত নাপিত আইল, আর প্রভু সন্ন্যাস করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন সকলে মহা কলরব করিয়া উঠিলেন, ও প্রভুকে সন্ন্যাস করিতে দিবেন না মনস্থ করিলেন। বৃদ্ধা নারী ও বিজ্ঞ পুরুষগণ প্রভুর কাছে যাইয়া বলিলেন, "ওহে বাপ্, তুমি নিবৃত্ত হও। তুমি যদি সন্ন্যাস কর আমরা সকলে গঙ্গায় প্রবেশ করিব। তোমার এই নবীন বয়স, এই অমানুষিক রূপ, এই লাবণ্য, ইহাতে যদি তুমি কৌপীন পরিধান কর ও দণ্ড কমণ্ডলু গ্রহণ কর, তাহা হইলে সংসারে আর জীবমাত্র থাকিবেনা, সকলেই উদাসীন হইবে।"

ইহাতে প্রভু উঠিয়া করযোড়ে বলিলেনঃ—"মা! বাবা! তোমরা দুঃখ প্রকাশ করিয়া আমাকে আর কষ্ট দিওনা। আমার যদি রূপ লাবণ্য থাকে তবে তাহা আর আমার প্রাণ নাথ শ্রীকৃষ্ণ ছাড়া আর কাহাকে দিব? আমাকে এই আশীর্ব্বাদ কর আমি সেই প্রাণ নাথকে পাই।" ইহা বলিয়া প্রভু আনন্দে ডগমগ হইয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন।

লোকের দুঃখ কিন্তু নিবারণ হইল না, বরং দ্বিগুণ বাড়িয়া উঠিল। যদি প্রভু সন্ন্যাস করিতেছেন বলিয়া আনন্দে নৃত্য না করিয়া রোদন করিতেন, তবে লোকের এত ক্লেশ হইত না। তখন যুবকেরা বৃদ্ধদিগকে বলিলেন যে, "আপনারা একটু সরিয়া যান, এই ভারতী সন্ন্যাসীটাকে বধ করি। এই বেটা যত অনর্থের মূল।" ইহাই বলিয়া ভারতীকে ঘেরিয়া মহা তর্জ্জন গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। বৃদ্ধ ও বৃদ্ধাগণ আর ভারতীকে মারিতে গেলেন না, কিন্তু তাহারা তাহার পায় ধরিয়া পড়িলেন, আর যুবতী-গণ সজল নয়নে ভারতীর দিকে চাহিয়া কথা না কহিয়া নয়নের দ্বারা তাহাকে অনুনয় বিনয় করিতে লাগিলেন।

তখন ভারতী যুবকদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "বাপ গণ, উত্তম বিবেচনা করিয়াছ! আমাকে বধ কর! তাহা হইলে আমারও দুঃখ যায়। এই যে নবীন রূপবান ব্রাহ্মণ কুমারটী দেখিতেছ ইনি স্বয়ং ভগবান। আমি ইহার হাতে দণ্ড দিয়া ঘরের বাহির করিলে এ কলঙ্ক ও দুঃখ আমার চিরকাল রহিবে। তোমরা আমাকে বধ কর, সেই আমার এখন পরম মঙ্গল। তবে আমি যে এই ভগবান চন্দ্রকে সন্ন্যাস করাইতেছি, ইহা কেবল বাধ্য হইয়া। শ্রীভগবানের আজ্ঞা কি জীবে লংঘন করিতে পারে?" তখন ভারতীকে ত্যাগ করিয়া সকলে আবার প্রভুকে অনুনয় করিতে লাগিলেন।

পরে নাপীত প্রভুর সেই সুন্দর কেশ মুণ্ডন করিতে বসিলেন। সুন্দর কেশ একথা বলার তাৎপর্য্য এই যে তাঁহার কেশ যেরূপ সুন্দর

ছিল সেরূপ কেহ কখন দেখে নাই। এখন রসিকানন্দন এই কেশ মুণ্ডনের বর্ণনা করিতেছেন ঃ—

"তখনে নাপীত আসি, প্রভুর সম্মুখে বসি,
ক্ষুর দিল সে চাচর কেশে।
করি অতি উচ্চরব, কান্দে যত লোক সব,
নয়নের জলে দেহ ভাসে॥
হরি হরি কিনা হৈল কাঞ্চন নগরে।
যতেক নগর বাসী, দিবসে হইল নিশি,
প্রবেশিল শোকের সাগরে॥
মুণ্ডন করিতে কেশ, হৈয়া অতি প্রেমাবেশ,
নাপীত কান্দয়ে উচ্চরায়।
কি হৈল কি হৈল বলে, ক্ষুর আর নাহি চলে,
প্রাণ ফাটি বিদরিয়া যায়॥
মহা উচ্চস্বর করি, কান্দে কুলবতী নারী,
সবাই সবার মুখ চাহিয়া।
ধৈরজ ধরিতে নারে, নয়ন যুগল নীরে,
ধারা বহে বয়ান বাহিয়া॥
দেখি কেশ অন্তর্দ্ধান, অন্তরে দগধে প্রাণ,
কান্দিছেন অবধৌত রায়।
রসিক নন্দের প্রাণ, সদা করে আন চান,
ফাটিয়া বাহির হৈয়া যায়॥

নাপীত আর ক্ষৌর করিতে পারে না। সে কান্দিয়া গড়াগড়ি দিতে লাগিল। পরে বলিতেছে "প্রভু! তুমি ভগবান আমি জানিয়াছি।" ইহা বলিয়া নাপীত নৃত্য করিতে লাগিল।

* * * * *

এখানে লেখক লেখনী রাখিয়া শ্রীগৌরাঙ্গকে স্তব করিতেছেন ঃ—

"হে প্রভু ! আমি জাতিতে, বুদ্ধিতে, বিদ্যায় সে নাপীত হইতে বড়। সে তোমার মস্তক মুণ্ডন করিতে চাহিল না। কিন্তু বিদ্যা ও কুলে বড় হইয়াও আমি তোমার সন্ন্যাস লিখিতেছি। কই আমার ত হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে না। ইহাতে বুঝিলাম যে তুমি প্রকৃতই দীনবন্ধু।"

* * * * *

নাপীত করযোড়ে বলিল, "প্রভু, তোমার মাথায় হাত দিব, এ হাত আবার কার পায় দিব, আর আমার চিরকালের নিমিত্ত অপরাধ হইবে।"

প্রভু বলিলেন, "তোমার এ বৃত্তি আর করিতে হইবে না।" এবং সেই আজ্ঞা ক্রমে কাটোয়ার সেই ভাগ্যবান্ পূজ্যপদ শ্রীমধু নাপীতের বংশীয়েরা চিনি ও গুড়ের ব্যবসা করিয়া থাকেন, স্বীয় বৃত্তি করেন না।

বেলা তৃতীয় প্রহরে ক্ষৌর কার্য্য সমাধা হইল। কখন ক্ষুর রাখিয়া নাপীত গড়াগড়ি দিতেছে। কখন প্রভু উঠিয়া আনন্দে নৃত্য করিতেছেন। পরে গঙ্গা স্নান করিতে গেলেন ও স্নান করিয়া আসিয়া অরুণ বসন মাগিলেন। তখন সকল লোকের মাথায় বজ্রাঘাত হইল।

বাসুদেব ঘোষ বলিতেছেন।

"মুড়াইয়া চাঁচর চুলে, স্নান করি গঙ্গাজলে,
বলে দেহ অরুণ বসন।
গৌরাঙ্গের বচন, শুনিয়া ভকতগণ,
উচ্চৈঃস্বরে করয়ে রোদন॥
অরুণ দুই খানি ফালি, ভারতী দিলেন আনি,
আর দিল একটী কৌপিণ।
মস্তকে পরশ করি, পরিলেন গৌরহরি,
আপনাকে মানে অতি দীন॥
তোমরা বান্ধব মোর, এই আশীর্ব্বাদ কর,

নিজ কর দিয়া মোর মাথে।
করিলাম সন্ন্যাস, নহে যেন উপহাস,
ব্রজে যেন পাই ব্রজনাথে॥
এত বলি গৌর রায়, উর্দ্ধ মুখ করি ধায়,
দিক্ বিদিক্ নাহি মানে।
ভক্ত জনার পাছে পাছে, লোটায়ে লোটায়ে কান্দে,
বাসু ঘোষ হাকান্দ কান্দেনে॥"

শ্রীবৃন্দাবনে মহান্তগণের সমাধি।

ভক্তমাল গ্রন্থে এই সম্বন্ধে কিছু কিছু উল্লেখ আছে। ভক্তগণের উপহারার্থে এই গ্রন্থ হইতে সংগ্রহ করিয়া তাহা লিখিতেছি। দ্বাদশ আদিত্য টিলায় শ্রীসনাতন গোস্বামীর বাস ছিল। জগদানন্দ যখন বৃন্দাবন যান, তখন সেই খানে সনাতন গোস্বামীর সহিত বাস করিয়াছিলেন। আর প্রভু বৃন্দাবনে পুনরায় যাইবেন বলিয়া সেই খানে শ্রীসনাতন তাঁহার নিমিত্ত এক খানি গৃহ করেন। সেই স্থানে শ্রীলসনাতন গোস্বামীর সমাধি। সেই সমাধি আমি প্রণাম করি। সনাতন গোস্বামীকে প্রভু গৌরাঙ্গ নিজ হস্তে লিপি লিখিতেন।

শ্রীলোচন কুঞ্জে শ্রীরূপ গোস্বামীর সমাধি। তাহার পার্শ্বে তাঁহার ভ্রাতপুত্র ও শিষ্য শ্রীজীব গোস্বামীর সমাধি। হে প্রভু শ্রীরূপ! হে শ্রীজীব! জীবগণের প্রতি কৃপা কর।

নন্দ কূপের নিকট যেখানে শ্রীকৃষ্ণের কালিয়া দমন মূর্ত্তি প্রকাশ আছে, তাহার নিকট শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতীর সমাধি। এই সরস্বতী ঠাকুর পূর্ব্বে পর্ব্বত হইতেও উচ্চ হইয়া, পরে শ্রীগৌরাঙ্গের কৃপায়,

তৃণ হইতেও লঘু হইয়াছিলেন।

শ্রীপণ্ডিত গৌরি দাসের সমাধি সম্বন্ধে ভক্তমালে এইরূপ লিখিত আছেঃ—

রাধা কুণ্ড বিংারের অতি রম্য স্থান।
মণি কর্ণিকার ঘাট কদম্বের বন॥
গৌরি দাস পণ্ডিতের সমাধি তথায়।

যাহাকে আন্ধরিক বট ও যেখানে রাধা কৃষ্ণ লুকা চুরি খেলিতেন, সেখানে আচার্য্য প্রভুর সমাধি। আর ছয় চক্রবর্ত্তীর সমাধিও তাহার নিকট।

যাঁহার নৃত্য শ্রীগৌরাঙ্গের নৃত্যের ন্যায় মনোহর ছিল, সেই সুন্দর রূপবান বক্রেশ্বরের সমাধি ধীর সমীরের মন্দিরের নিকট।

বংশীবটের নিকটে রাধা বাগ ও তাহার পূর্ব্বে পানীঘাটা। সেখানে গৌর গদাধরের মূর্ত্তি। দাস গোস্বামীকে মহাপ্রভু গোবর্দ্ধন শীলা সেবার নিমিত্ত দেন। সেই শীলা লোকনাথ গোস্বামীর নিকট গোকুলানন্দ-রূপে প্রকাশ হন। লোকনাথ গোস্বামীর দুই সেবা ছিল। গোকুলানন্দ ও রাধা বিনোদ। তাঁহার সমাধি সেই স্থানে। শ্রীলোকনাথ গোস্বামীর কৃপায় আমরা ঠাকুর মহাশয়কে পাইয়াছি।

যেখানে শ্রীরাধারমণ জিউর মন্দির তাহার নিকট শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামীর সমাধি। ঈশ্বরী জাহ্নবি দেবীর প্রাণ শ্রীগোপীনাথের মন্দিরের নিকট শ্রীমধু পণ্ডিতের সমাধি। উাহার নিকট জগদীশ পণ্ডিতের কুঞ্জ ও সমাধি। শৈশব লীলায়প্রভু এই পণ্ডিতের হরি বাসরের নৈবদ্য চাহিয়া ভোজন করিয়াছিলেন। ইনি প্রভুর পিতা জগন্নাথ মিশ্রের পরম বন্ধু ছিলেন।

শ্রীহনুমানের মন্দির যেখানে সেখানে শ্রীভট্ট গোস্বামীর সমাধি। ও তাহার নিকট কাশীশ্বর গোস্বামীর সমাধি। ইনি প্রভুর অতি ঘনিষ্ট পার্ষদ তাহা সকলেই জানেন। তাহার দক্ষিণে হরিদাস গোস্বামীর সমাধি।

যাঁহারা শ্রীবৃন্দাবন ধামে গমন করেন, তাঁহারা এই সমুদয় সমাধি গুলি দর্শন ও প্রণাম করিয়া আসিবেন। যাহারা যাইতে না পারেন, মনে মনে চিন্তা করিবেন, তাহা হইলে প্রভু গোস্বামীগণের কৃপা হইবে।

ঠাকুর কৃষ্ণদাস কবিরাজের অন্তর্ধ্যান।

"শ্রীপ্রেম বিলাস" গ্রন্থে ঠাকুর কৃষ্ণ দাস কবিরাজের অন্তর্দ্ধ্যান অতি সুন্দর রূপে বর্ণিত আছে। আমরা উহা প্রকাশ করিলাম। শ্রীশ্রীনিবাস আচার্য্যপ্রভু ও শ্রীনরোত্তমঠাকুর মহাশয় গোস্বামীদের কৃত গ্রন্থ সিন্দুক বোঝাই করিয়া বৃন্দাবন পরিত্যাগ করিলেন ও ক্রমে বঙ্গদেশে উপস্থিত হইলেন। এক রাত্তে গোপালপুর নামক গ্রামে তাঁহারা উপস্থিত হন, এবং সেখান হইতে সিন্দুকপূর্ণ পুস্তকগুলি বিষ্ণুপুরের রাজা বীর হাম্বির আপনার অস্ত্রধারী লোকের দ্বারা অপহরণ করেন। আচার্য্য প্রভু এই সম্বাদ পত্র দ্বারা শ্রীজীব গোস্বামীকে জ্ঞাত করেন, এবং "শ্রীপ্রেম বিলাস" গ্রন্থ বলেনঃ—

"এথা আচার্য্য ঠাকুর বুলে খেদ করি।
কতো দিনে লোক গেল মথুরা নগরী॥
আর দিন পত্র লয়া গোসাঞিির স্থানে।
পত্র দিয়া সব বাক্য কৈল নিবেদনে॥
শ্রীজীব পড়িল পত্র কারণ বুঝিল।
লোক নাথ গোসাঞি স্থানে সকল কহিল॥
শ্রীভট্ট গোসাঞি শুনিলেন সব কথা।
কাঁদিয়া কহয়ে পাইলাম মনে ব্যথা॥
রঘুনাথ, কবিরাজ, শুনিল দুই জনে।
কান্দিয়া কান্দিয়া পড়ে লুটাইয়া ভূমে॥
কবিরাজ কহে প্রভু না বুঝি কারণ।
কি করিল কিবা হইল ভাবে মনে মন॥
জরা কালে কবিরাজ না পারে চলিতে।
অন্তর্দ্ধ্যান কৈল সেই দুঃখের সহিতে॥

কুণ্ড তটে বসিয়া করয়ে অনুতাপ ।
উচ্ছলি পড়িল যাই দিয়া বড় ঝাঁপ ॥
বিরহ বেদন কত সহিব পরাণে ।
মনের যতেক দুঃখ কেবা তাহা জানে ॥
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নিত্যানন্দ কৃপাময় ।
তোমা বিনা আর কেবা আমার আছয় ॥
অদ্বৈত্যাদি ভক্তগণ করুণা হৃদয় ।
কৃষ্ণদাস প্রতি সবে হইও সদয় ॥
প্রভু রূপ সনাতন ভট্ট রঘুনাথ ।
কোথা গেলে আমারে করহ আত্মসাত ॥
লোক নাথ গোপাল ভট্ট শ্রীজীব গোসাঞি ।
তোমরা দয়া কর মোর আর কেহ নাই ॥
শ্রীদাস গোসাঞি দেহ নিজ পদ দান ।
জীবনে মরণ প্রাপ্তি যার করি ধ্যান ॥
বুকে হাত দিয়া কান্দে রঘুনাথ দাস ।
মরমে রহিল শেল না পুরিল আশ ॥
তুমি গেলে আর কেবা আছয়ে আমার ।
ফুকরে ফুকরে কান্দে হস্তে ধরি তার ॥
তুমি ছাড়ি যাও মোরে অনাথ করিয়া ।
কেমনে বঞ্চিব কাল এ দুঃখ সহিয়া ।
নিজ নেত্র কৃষ্ণ দাস রঘুনাথের মুখে ।
চরণ ধরিয়া আনি আপনার বুকে ॥
ওহে রাধা কুণ্ড তীর বাস দেহ দান ।
রাধা প্রিয় রঘুনাথ হয়েন কৃপাবান ॥
যেই গণে স্থিতি তাহা করিতে ভাবন ।
মুদ্রিত নয়নে প্রাণ কৈল নিষ্ক্রামন ॥

রঘুনাথ কান্দে তাঁর বুকে দিয়া হাত ।
ছাড়ি গেলা রাখি মোরে করিয়া অনাথ ॥
কতেক লিখিব দুঃখ কহনে না যায় ।
কবিরাজ কবিরাজ বলি সবে গুণ গায় ॥
সিদ্ধের প্রসঙ্গ যত কহনে না যায় ।
সেই সে জানয়ে মনে যারে কৃপা হয় ॥

উপরি উক্ত ঘটনাটি শ্রীরাধা কুণ্ড তটে ঘটিয়াছিল । ভগবান শ্রীগৌর চন্দ্র শ্রীবৃন্দাবন দর্শন কালে তিনি শ্রীরাধা কুণ্ডের স্থানটি প্রকাশ করেন এবং শ্রীদাস গোস্বামী ও ঠাকুর শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ সেই শ্রীকুণ্ড তটে বাস করিতেন ।

শ্রীজীব গেস্বামির উপর ঠাকুর শ্রীকবিরাজ গোস্বামীর যে প্রগাঢ় ভক্তি ও ভাল বাসা ছিল, উপরি উক্ত পদ গুলি পাঠে তাহার প্রতি কাহার সন্দেহ থাকে না । শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থের এক জন সংগ্রহ কর্ত্তা লিখিয়াছেন, শ্রীশ্রীজীব গোস্বামী এরূপ সংকীর্ণচেতা ছিলেন যে শ্রীচৈতন্যামৃত গ্রন্থ বাঙ্গলায় পাঠাইতে তিনি সম্মত হন না । শ্রীশ্রীজীব গোস্বামী যদি শ্রীকবিরাজ ঠাকুরের প্রতি এই রূপ দ্বেষ ও ঈর্ষার চিহ্ন দেখাইতেন, তাহা হইলে তাঁহার শ্রীশ্রীজীব গোস্বামীর উপর ভক্তি কি ভাল বাসা থাকার সম্ভাবনা থাকিত না । উক্ত সংগ্রহকর্ত্তা যাহা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা তিনি কোথা পাইলেন তাহা আমরা জানিনা । তিনি এরূপ মত প্রকাশ করিয়া অপরাধ করিয়াছেন, এবং আমরা প্রার্থনা করি প্রভু তাহাকে ক্ষমা করিবেন ।

শ্রীগ্রন্থ পরিচয় ।

গতবারে বলিয়াছি যে স্বরূপ দামোদরের কড়চা বলিয়া এক খানি যাহা প্রচলিত আছে তাহা কৃত্রিম । যে খানি মূল, তাহাতে শ্রীগৌরাঙ্গের মূখ্য লীলা সমস্ত বর্ণিত আছে ।

"শ্রীচৈতন্য চন্দ্রামৃত" গ্রন্থ শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভুর ভক্তগণের পক্ষে অতি উপাদেয় গ্রন্থ। প্রভুর কৃপায় এই গ্রন্থ এখন অনেকে আস্বাদন করিয়াছেন। ইহার প্রণেতা শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতী। ইঁহার জীবনী সম্প্রতি শ্রীবলরাম দাস প্রকাশ করিয়াছেন। ইহার বাঙ্গলা অনুবাদ প্রথমে নিত্যানন্দ-দায়িনী পত্রিকার সম্পাদক করেন। তাহার পর ভক্তি ভাজন শ্রীরাম নারায়ণ বিদ্যারত্ন আবার ইহা প্রকাশ করেন। সম্প্রতি ভাটপাড়া নিবাসী পরম ভক্ত কবিবর শ্রীরাম দয়াল ঘোষ অতি অপূর্ব্বরূপে চন্দ্রামৃতের পদ্যাকারে বাঙ্গলা অনুবাদ করিয়াছেন।

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর লীলা বর্ণন করিয়া শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুর এক খানি গ্রন্থ প্রস্তুত করেন। তাহা শ্রীনিত্যানন্দ বংশ সম্ভূত প্রভু শ্রীনবদ্বীপ চন্দ্র গোস্বামীর সাহায্যে মুদ্রিত হয়। দুর্ভাগ্যক্রমে এই গ্রন্থের সমুদয় প্রকাশিত হয় নাই। সুতরাং এই গ্রন্থ খানি সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করা কর্ত্তব্য।

একটী সতীর সমাধ দর্শন।

১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে ৭ই সেপ্টেম্বরের অমৃতবাজার পত্রিকায় নিম্নের সহমরণের বিবরণটি প্রকাশিত হয়। উক্ত পত্রিকার সম্পাদক স্বচক্ষে সমাধিটি দর্শন করেন, এবং বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া উহার নিম্ন লিখিত বিবরণটি প্রকাশ করেন।

"একটী ক্ষুদ্র খালের ধারে আমরা দুইটি ক্ষুদ্র সমাধি দর্শন করি। সমাধি স্থানটি এক জন গোস্বামী প্রভুর গৃহের নিকট ইহাতে কিছু আশ্চর্য্যান্বিত ও কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া আমাদের সঙ্গে যে গ্রামস্থ ভদ্র লোকটী ছিলেন, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, ও তিনি সমাধি সম্বন্ধে আমাদিগকে এইরূপ বলিলেন।

'আপনারা যে সমাধি দর্শন করিতেছেন, উহা মুসলমানদিগের কবর নহে। এই গ্রামে যে গোস্বামী বংশ আছেন, সেই বংশের

এক জন পতিব্রতা রমণী তাঁহার স্বামীর সঙ্গে সহমরণ গমন করেন। এ সমাধি দুটি সেই পতিব্রতা রমণীর ও তাঁহার স্বামীর, তাঁহাদের চিতার ভস্মরাশি এই সমাধিদ্বয়ের মধ্যে রহিয়াছে। এই ঘটনাটি অতি দীর্ঘকাল হয় নাই। যাহারা ইহা দর্শন করিয়াছিলেন এরূপ লোক এখনও গ্রামে জীবিত আছেন।"

এই কথা শুনিয়া আমাদের মনে এক অলৌকিক ভাবের উদয় হইল। আমরা গললগ্ন কৃতবাস হইয়া সমাধির সমীপে স্তব করিতে লাগিলাম এবং কর জোড় পুর্ব্বক বলিলাম, "হে সাধ্বী! হে পতিপ্রাণা! হে সতী লক্ষী! আমাদিগকে নিষ্কাম সেবা শিক্ষা প্রদান কর। আমাদিগকে ভক্তি, পতিব্রতা ধর্ম্ম ও নিস্বার্থ প্রেম দান কর,"

এই গ্রাম খানি বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত। ইহার নাম গদার ডিহি। এখানে যে গোস্বামী বংশের বাস তাঁহারা দেশের মধ্যে বিখ্যাত বংশ। আমরা অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পাইলাম যে, যাহার স্ত্রী সহমরণ গমন করেন, তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা তখনও জীবিত আছেন। আমরা তাহার নিকট গমন করিলাম ও তাহার কাছে শুনিলাম যে, যখন তাহার জ্যেষ্ঠের সঙ্গে তাহার স্ত্রী সহমরণ গমন করেন, তখন তাহার বয়স ২২ বৎসর, তাহার জ্যেষ্ঠের বয়স ৪৫ বৎসর, এবং ভ্রাতৃ-বধূর বয়স ২৫ বৎসর। আজ ৫৯ বৎসর হইল তাহার ভ্রাতৃবধূ সহমরণে গমন করিয়াছেন। সুতরাং যিনি আমাদিগকে ইহা বলিলেন তাহার বয়স তখন ৮১ বৎসর হইবে। যাহার স্ত্রী সহমরণ গমন করেন, তাহার নাম ব্রহ্মানন্দ গোস্বামী, প্রভাতে জ্বর রোগে তাহার মৃত্যু হয়। কনিষ্ঠ ভ্রাতা আমাদিগকে সহ মরণ সম্বন্ধে যাহা বলিলেন তাহা আমরা নিম্নে প্রকাশ করিলাম ঃ—

"আমার জ্যেষ্ঠের মৃত্যু হইলে আমার ভ্রাতৃ বধূ নিরবে মৃত স্বামীর সমীপে উপবেশন করিলেন। তাঁহার চক্ষু দিয়া বিন্দুমাত্র জল পড়িল না। তাঁহার অশ্রুশূন্য নয়ন দেখিয়া আমরা ভীত হইলাম এবং

মনে মনে প্রার্থনা করিতে লাগিলাম যে; তাঁহার নয়ন দিয়া এক বিন্দু জল পড়ুক ও তাঁহার হৃদয় শীতল হউক। কিন্তু তিনি ক্রন্দন করিলেন না, আত্মনাদ করিলেন না, একটি দীর্ঘ নিশ্বাসও ত্যাগ করিলেন না। স্থির হইয়া স্বামীর মৃত দেহ দর্শন করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে তিনি সহসা উঠিয়া দাঁড়াইলেন, এবং কাহাকে কিছু না বলিয়া, কোন দিকে না তাকাইয়া, সন্নিকটবর্ত্তী শ্রীশ্রীকৃষ্ণের মন্দিরের দিকে ধীরে ধীরে গমন করিলেন। সকলে তাঁহার ভাব ও মূর্ত্তি দেখিয়া স্তম্ভিত ও আকৃষ্ট হইল, এবং শত শত স্ত্রী পুরুষ তাঁহর সঙ্গে সঙ্গে গমন করিল। তিনি ঠাকুর মন্দিরে উপস্থিত হইলেন। অনিমিষ লোচনে কিয়ৎক্ষণ শ্রীশ্রীকৃষ্ণের মূর্ত্তি দর্শন করিয়া ভূমিতে লুণ্ঠিত হইয়া ষাষ্টাঙ্গে তাঁহাকে প্রণিপাত করিলেন। প্রণাম করিয়া দাঁড়াইলেন, এবং অঙ্গের অভরণ গুলি একে একে সমুদয় উন্মোচন করিলেন এবং শ্রীশ্রীকৃষ্ণের চরণে সে গুলি অর্পণ করিলেন। স্বামীর মৃত্যু হইতে এ পর্য্যন্ত তিনি কোন কথাই কহিয়াছিলেন না। অঙ্গের অভরণ গুলি শ্রীশ্রীকৃষ্ণের চরণে অর্পণ করা হইলে তাঁহার বাক্য স্ফুটিত হইল এবং গদ গদ স্বরে ও কর জোড়ে তিনি শ্রীকৃষ্ণকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, ‘প্রভু! এ অভরণে আমার আর প্রয়োজন নাই, তুমি এ গুলি গ্রহণ কর’ শ্রীশ্রীকৃষ্ণকে আবার প্রণাম করিলেন এবং ধীরে ধীরে আবার স্বামীর মৃত দেহের নিকট আসিয়া স্থির হইয়া বসিলেন। সেখানে আসিয়া বলিলেন ‘তোমরা চুপ করিয়া কেন বসিয়া আছ। চিতার আয়োজন কর, উঁহাকে হারাইয়া আমার প্রাণ ধারণের সম্ভাবনা নাই। আমি উঁহার সঙ্গে গমন করিব।

“ভ্রাতৃ বধুর অশ্রুশূন্য নয়ন, অবিচলিত মুখ ভাব, তাঁহার শ্রীশ্রীকৃষ্ণের শ্রীচরণে অভরণ অর্পণ ইত্যাদি দেখিয়া আমরা সকলে পূর্ব্বেই ভীত হইয়া ছিলাম, কিন্তু যখন তিনি চিতা আয়োজনের কথা বলিলেন তখন আমরা নিস্পন্দ হইলাম। কিয়ৎক্ষণ আমরা কোন কথা বলিতে পারিলাম না, স্থির হইয়া ভ্রাতৃ বধুকে দর্শন করিতে লাগিলাম। ক্রমে সন্ধ্যা হইল এবং আমরা তাঁহাকে এই দুরূহ কার্য্য হইতে নিবৃত্তি করিবার যত্ন করিতে লাগিলাম। আমরা নানারূপ বুঝাইলাম, কিন্তু তাঁহার মুখে কেবল এক কথা: ‘উঁহাকে হারাইয়া আমার প্রাণ ধারণের সম্ভাবনা নাই, আমি উঁহার সঙ্গে গমন করিব, তোমরা চিতার আয়োজন কর।’ হিন্দু মহিলাগণ শ্বশুর শাশুড়ীকে দেবতার ন্যায় ভক্তি করিয়া থাকেন। তাঁহারা আসিয়া তাঁহাকে নিবৃত্ত হইতে বলিলেন, তিনি অধোমুখ করিয়া রহিলেন এবং মৃদুস্বরে মধ্যে মধ্যে বলিতে লাগিলেন ‘আমাকে আপনারা রাখিতে পারিবেন না, আমার জীবিত থাকার সম্ভাবনা নাই।’ আমরা ভাবিলাম তাঁহার দীক্ষা গুরুর আজ্ঞা তিনি লঙ্ঘন করিবেন না। গুরু ও পুরোহিত আসিলেন এবং তাঁহারা তাঁহাকে নানারূপে বুঝাইতে লাগিলেন। তিনি তাঁহাদের কোন কথার উত্তর দিলেন না, কেবল সকাতরে করজোড়ে গুরুদেবের চরণ পানে তাকাইয়া রহিলেন।

“আমরা ভাবিয়াছিলাম যে, শোকের প্রথমাঘাত তাঁহাকে অবিভূর্ত করিয়াছে, ক্রমে তিনি ইহা সম্বরণ করিবেন, এবং সম্বরণ করিলে আর সহমরণ গমন করিতে সাহস করিবেন না। আমরা এই জন্যে অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার বিলম্ব করিতে লাগিলাম, কিন্তু যদিও এই জন্যে অনেক সময় অতিবাহিত হইল, তাঁহার সংকল্প বিন্দুমাত্র টলিল না। আমরা উপায়শূন্য হইয়া শেষে তাঁহাকে ভয় প্রদর্শন করিতে লাগিলাম। হুতাশনে প্রাণ ত্যাগ করিলে তাঁহার যে বিষম যন্ত্রণা সহ্য করিতে হইবে, আমরা তাঁহাকে তাহাই বুঝাইতে লাগিলাম। তিনি প্রথম আমাদের কথায় কর্ণপাত করিলেন না, শেষে মুখে ঘৃণার ভাব প্রকাশ করিতে লাগিলেন, পরে একটু উত্তেজিত হইলেন, উত্তেজিত হইয়া আবার তাঁহার মুখে মধুর ভাব ধারণ করিল, এবং বোধ হইল চক্ষু সজল হইয়াছে। তিনি আমাদিগকে বলিলেন, ‘তোমরা আমাকে

স্নেহ কর, হুতাশনে প্রাণ ত্যাগ করিতে আমার যে কষ্ট হইবে, তাহাই মনে করিয়া কাতর হইতেছ। কিন্তু তোমাদিগকে একটি নিগূঢ় সত্য বলি। আমার জীবিতেশ্বরের সঙ্গে আমার জীবন চলিয়া গিয়াছে, আমার দেহে প্রাণ নাই, কাজেই শারীরিক কষ্ট হইবে না। আমি তোমাদিগকে ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেখাইতেছি'। ইহাই বলিয়া নিকটস্থ জ্বলন্ত প্রদীপ শিখায় অঙ্গুলি রাখিলেন। অঙ্গুলি পুড়িতে লাগিল, তিনি স্থির হইয়া বসিয়া রহিলেন, তাঁহার মুখে বিন্দুমাত্র কষ্ট চিহ্ন দেখা দিলনা।

"বেলা চারিটার সময় জ্যেষ্ঠের শব লইয়া ঐ খাল ধারে গমন করিলাম। ভ্রাতৃবধূ ধীরে ২ শবের বাম দিকে গমন করিতে লাগিলেন। এই সময় সকলেরই মনে এক নূতন ভাবের উদয় হইল। আমার জননী শোক তাপ ভুলিয়া গেলেন, পূর্ব্বে যাঁহারা ক্রন্দন করিতেছিলেন তাঁহারা রোদন সম্বরণ করিলেন। নানা দিক হইতে লোকের সমাগম হইতে লাগিল। কুল বধূগণ পাগলিনীর মত হইয়া গৃহের বাহির হইলেন। অগ্রে মৃতস্বামী ও তাহার সহধর্ম্মিণী, এবং পশ্চাতে সহস্র সহস্র লোক উচ্চৈঃস্বরে হরিধ্বনি করিতে করিতে চলিলেন।

"আমরা ক্রমে খাল ধারে উপস্থিত হইয়া মৃত দেহ নামাইলাম ও জল উঠাইয়া উহা ধৌত করিতে লাগিলাম। এ দিকে ভ্রাতৃবধূ জলে অবতরণ করিয়া স্নান করিলেন। শত শত লোক উন্মত্তের ন্যায় চিতার আয়োজন করিতে লাগিল। নানা দিক হইতে শুষ্ক কাষ্ঠ আনিয়া তাহারা পর্ব্বতাকার করিল। আমরা চিতায় মৃত দেহ শয়ন করাইয়া তাহার চতুস্পার্শ্বে কাষ্ঠ সাজাইতে লাগিলাম, এবং ভ্রাতৃবধূ সেই সময় সিক্ত বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া এক খানি নূতন শাড়ী পরিধান করিলেন, এবং কপালে সিন্দুর দিয়া উহা উজ্জ্বল করিলেন। পারিবারিক ও প্রতিবেসিনী রমণীগণ আসিয়া তাঁহার কেশ সুশৃঙ্খল করিয়া পুষ্প হারে সাজাইয়া দিলেন। তিনি এইরূপ সুসজ্জিত হইয়া সাত বার চিতা প্রদক্ষিণ ও স্বামীর মৃত দেহকে প্রণাম করিলেন।

প্রণাম করিয়া চিতা আরোহণের উদ্যোগ করিলেন। তাঁহার আত্মীয় স্বজন এই সময় তাঁহার নিকট কদলী, কড়ী এবং গুবাক ধরিলেন, তিনি দুই হস্ত দ্বারা উহা সমাগত লোকের মধ্যে নিঃক্ষেপ করিতে লাগিলেন। সে সময় তাঁহাকে মূর্ত্তিমতী দেবী বলিয়া বোধ হইল। অনিমিষ নয়নে অনেকে তাঁহার রূপ দর্শন করিতে লাগিল। অনেকে দর্শন করিয়া অশ্রুপাত করিতে লাগিল। তাঁহার সম্মুখে বসিয়া কেহ বা তাঁহার পদ ধূলী চাহিতে লাগিল। কেহ তাঁহার আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিতে লাগিল। কেহ তাঁহার প্রদত্ত কদলী, কড়ি, সুপারি কুড়াইয়া প্রথমে শিরে ধারণ, তৎপরে বস্ত্রে বন্ধন করিতে লাগিল। সে সময় আমাদের মনে যে ভাবের উদয় হইয়াছিল, তাহা এখন স্বপ্ন বলিয়া বোধ হয়। আমি বৃদ্ধ হইয়াছি, এ জীবনে অনেক উৎসব, আনন্দ, শোক, তাপ ভোগ করিয়াছি। সে সময় যাহা দর্শন কি অনুভব করি, জীবনের মধ্যে আর কখন ওরূপ অনুভব কি দর্শন করিলাম না।

"ভ্রাতৃবধূ ক্রমে চিতারোহণ করিলেন। সেখানে গিয়া স্বামীর বাম দিকে শয়ন করিয়া তাঁহাকে গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন এবং চিতায় অগ্নি প্রদান করিতে বলিলেন। চিতার চারিদিকে লোকে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিল, অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া শিখা গগণস্পর্শ করিল। তিনি চিতার মধ্য হইতে দক্ষিণ হস্ত উঠাইয়া "হরিবোল হরিবোল" এই ধ্বনি করিতে লাগিলেন। উপস্থিত সকলে সেই সঙ্গে ২ হরিধ্বনি করিতে লাগিলেন, হরিধ্বনিতে গগণ আচ্ছাদন করিল, এবং শরীরে অগ্নি স্পর্শ করিবার পূর্ব্বে সতী প্রাণত্যাগ করিলেন।'

শ্রীচরিতামৃত আদ্য খণ্ডে ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদে দেখিতেছি :—

"আদি লীলা মধ্যে প্রভুর যতেক চরিত।
সূত্র রূপে মুরারী গুপ্ত করিল গ্রন্থিত॥
প্রভুর মধ্য শেষ লীলা স্বরূপ দামোদর।
সূত্র করি গ্রন্থিলেন গ্রন্থের ভিতর॥

এই দুই জনের সূত্র দেখিয়া শুনিয়া।
বর্ণনা করেন বৈষ্ণব ক্রম যে করিয়া॥"

আবার একটু নীচে কবিরাজ গোস্বামী লিখিতেছেনঃ—

"দামোদর স্বরূপ আর গুপ্ত মুরারী।
মুখ্য মুখ্য লীলা সূত্র লিখিয়াছে বিচারি॥

এই স্বরূপ দামোদরের গ্রন্থ কোথায়? প্রভুর লীলা, স্বরূপের লেখা, ইহাতে বহু মূল্য সামগ্রী! ইহা কি লোপ হইল? এ দুঃখ অসহ্যনীয়।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য চন্দ্রায় নমঃ।

বদন গঞ্জ পোষ্টাপিস। চৈতন্যাব্দ ৪০৫।

এই পত্র খানি প্রকাশক পাইয়াছেনঃ—

"কৃষ্ণভক্তিং রসতাবিতা মতিঃ ক্রীয়তাং যদি কুতপি লভ্যতে।
তত্রশৌল্য মপি মূল্য মেকলং জন্ম কেটিসুকৃতৈ ন লভ্যতে॥

ভূম্যবলুণ্ঠিত বৈষ্ণব চরণে প্রণতি পুরঃসর সমাবেদন মিদং। মহাশয়! আপনার পবিত্র কর কমল হইতে উদ্ভূত মুদ্রাঙ্কিত পত্রখানি প্রাপ্ত হইয়া সাদরে গ্রহণ পূর্ব্বক তন্মর্ম্মাবগতান্তে কৃতার্থ হইয়াছি।

আমাদিগের বড়ই সৌভাগ্য, ধন্য আপনাদিগের প্রযত্নতা। জীব উদ্ধারের নিমিত্ত চতুর্দ্দশ শকাব্দে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ এবং শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ এবং শ্রীশ্রীঅদ্বৈত এই প্রভু ত্রয় অবতীর্ণ ও একত্র মিলিত হইয়া জীবকে যে ধর্ম্ম শিক্ষা দেন, এবং তৎ পারিষদ মহামহোপাধ্যায় বহুশাস্ত্রবেত্তা বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রবর্ত্তক শ্রীলঃ শ্রীসনাতন এবং শ্রীমদ্রূপ ও শ্রীশ্রীজীব ও শ্রীরঘুনাথ গোস্বামী প্রভৃতি গুরুদেবগণ জীব উদ্ধারের নিমিত্ত যে সকল ভক্তি শাস্ত্র প্রকাশ করেন, সেই সকল দুল্লভ গ্রন্থ এখনকার কালে "চোক থাকতে কানা, কান্ থাক্‌তে বধির, এবম্ভূত নাস্তিক দল বিজাতীয় বিদ্যায় মত্ততা বশতঃ পাঠ করেন না, দেখেও দেখেন না, শুনেও শুনেন না।

সুতরাং এই কারণে ভক্তি শাস্ত্র চর্চ্চা ক্রমে২ হ্রাস হইতেছে দেখিয়াই সুস্পষ্ট বোধ হইতেছে যে, পূর্ব্বোক্ত শকে তিন প্রভু একত্র হইয়া যে রূপ সুলভ ভক্তি বিতরণ করিয়া ছিলেন, তদ্রূপ ভক্তির পরকাষ্ঠা প্রদর্শনার্থে এই ১৮১১ শকাব্দে তাঁহাদের কৃপাভাজন শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য প্রভুবংশ সম্ভূত শ্রীগুরুদেব রাধিকা নাথ গোস্বামী জীউ, বৈষ্ণবাগ্রগণ্য ভক্তি

বিনোদ শ্রীযুক্ত বাবু কেদার নাথ দত্ত মহাশয় এবং আপনি এই তিন জনায় মিলিত হইয়া শুভদিন শুভক্ষণে যখন "শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া নাম্নী" পাক্ষিক পত্রিকার সৃষ্টি করিয়াছেন তখন আর আমাদিগের কোন ভয় নাই।

আপনাদের করুণকটাক্ষ ও তেজস্বিনী লেখনী দ্বারা অতঃপর আমরা শিক্ষালাভ করিয়া আচার ভ্রষ্টতা হইতে বিমুক্ত হইব। এবং ঐ জ্ঞানাঞ্জন পত্রিকা দ্বারা অজ্ঞান মুগ্ধ জীবগণের চক্ষু উন্মীলন হইলেই অনায়াসে "বৈষ্ণবধর্ম্ম যে কিমদভূতং" তাহা অনেকেই জানিতে পারিবেন।

বলিতে কি যাহাতে, শ্রীকৃষ্ণ ভক্তিরস বর্ত্তমান আছে, তাহা দেব দুল্লভ বলিয়া সহজে লাভ হয় না। যদি ক্রয় করিতে পাওয়া যায় অবশ্যই মূল্য দিয়া ক্রয় করিতে অনেকেই সচেষ্ট হইবেন। আমরাও মূল্য দিয়া জন্মটা সার্থক বলিয়া জ্ঞান করিব। সামান্য বার্ষিক মূল্য দান করিতে কাহারও কোন ক্ষতি হইবে না, বরং লাভই হইবে।

কেননা আজিকাল ভক্তি শাস্ত্র চর্চ্চার অভাব বশতঃ দেশের শোচনীয় অবস্থা হইয়া উঠিয়াছে। তন্নিবন্ধন যাহাতে একটী ভক্তি শাস্ত্র পত্রিকা দেশে প্রচারিত হয়, এবং চাষী ভূষী মোটা মোটী সকল লোকেই তাহা অক্লেশে পাঠ করিয়া যাহাতে শিক্ষা লাভ করিতে পারে, সে বিষয়ে বদ্ধ পরিকর হওয়া সকলেরই কর্ত্তব্য।

কার্য্য কারণ সম্বন্ধে বলিতে হইতেছে, যে বিংশতি বৎসর হইল "নিত্যানন্দ দায়িনী" নামে একটী মাসিক পত্রিকার সৃষ্টি হইয়া কিছুকাল বৈষ্ণব দিগের পুষ্টি এবং তুষ্টি সাধন করিয়া ছিলেন। দৈব দুর্বিপাকে পড়িয়া প্রভু ইচ্ছায় সে পত্র লোপ হয়। তাহার বহু দিন পরেই যদিও "সজ্জনতোষিনী" "প্রেম প্রচারিণী" এবং "বৈষ্ণব" প্রভৃতি কএকটী মাসিক পত্রিকা প্রকাশ হইয়াছিল, পরন্তু, আমাদিগের দুর্ভাগ্য বশতঃ একে একে সে সকল অন্তর্হিত হইয়াছেন, তজ্জন্য আমরা বিশেষ দুঃখিত আছি। এক্ষণে "বিষ্ণু প্রিয়া" মাতাকে দর্শন করিতে পাইলে আমাদিগের সে দুঃখের শান্তি, বিশেষতঃ আপনাদের কৃপায় দেশের অভাব মোচন, এবং বৈষ্ণব ধর্ম্ম স্থাপন হইবে, তার আর বিচিত্র কি?

আমি অতি মূর্খ ও অধম, আমার প্রকৃতিও যার পর নাই মন্দ। যে বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছি তাহার কিছুমাত্র আচার ব্যাবহার করিতে পারি নাই। আমার পূর্ব্ব পুরুষ বৈশ্য কুলোদ্ভব মিথিলা নিবাসী মহাতমা শ্রীশ্রীকৃষ্ণদাস। ইনি শ্রীশ্রীজয়দেব গ্রন্থের গঙ্গা নামে টীকা করিয়া ছিলেন। ইনি অসাধারণ পাণ্ডিত্য বলে "গীতগোবিন্দের" সমুদয় অংশ উক্ত টিকায় প্রথমতঃ কৃষ্ণ পক্ষে, পরে শিবপক্ষে ব্যাখ্যা করিয়া যান।

দ্বিতীয়, তাঁহার পরবর্ত্তী শ্রীল শ্রীউদ্ধারণ দাস ঠাকুর মহাশয় ঐ বংশে উদ্ভব হইয়া শ্রীচৈতন্য শ্রীনিত্যানন্দ মহাপ্রভুর প্রিয় পারিকার ছিলেন। আজি ৪০০ চারি শত বৎ-

সরের কিছু অধিক হইল, ঐ মহাপুরুষের এবং অন্যান্য শ্রীচৈতন্য পারিষদ গোস্বামী
বৃন্দের পবিত্র হস্ত লিখিত কতক গুলিন রত্ন বিশিষ্ট প্রাচীন ভক্ত গ্রন্থ অদ্যাপিও
মৎগৃহে বর্ত্তমান থাকায় প্রাত্যাহিক সাধুজন কর্ত্তৃক তাহার পূজা পাঠ হইতেছে। যদিও
ঐ সকল গ্রন্থ এতাবৎ সুযতনে রক্ষা করিতেছি, কিন্তু নিজে "চিনির বলদ," গুরু
ও শিক্ষা অভাবে সে সকল গ্রন্থের পীযূষ রসাস্বাদনে নিতান্ত পরাঙ্মুখ।

ঐ সমস্ত প্রাচীন গ্রন্থরাজী হইতে "নিত্যানন্দ দায়িনী" পত্রিকার ভূত পূর্ব্ব
সম্পাদক পরম ভাগবত [শ্রীবৃন্দাবন ধাম প্রাপ্ত] শ্রীরাধা বিনোদ দাস বাবাজি
শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ দেবের তত্ত্ব নিরূপণ, ধ্যান, মন্ত্র, উপাসনা, পূজা, সপ্ত প্রকার অষ্টক,
এবং স্তব কল্প বৃক্ষ প্রভৃতি উদ্ধৃত করিয়া সময় সময়ে উক্ত পত্রিকায় প্রকাশ করিয়া-
ছিলেন।

ঐ সকল গ্রন্থ মধ্যে মহাতমা গুণরাজ খাঁন প্রণীত "শ্রীকৃষ্ণ বিজয়" নামক প্রাচীন
গ্রন্থ খানি মৎ পূজিত শ্রীযুক্ত ভক্তি বিনোদ মহাশয় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত
হইয়াছে। এবং অন্যান্য বিষয় "বাবা আউল মনোহর দাসের জীবন বৃতান্ত, ইতি
পূর্ব্বে "সজ্জন তোষিণী' পত্রিকায় দ্বিতীয় খণ্ডের, ২১৩ পৃষ্ঠায় বিস্তারিত প্রকাশ আছে।

বৈষ্ণব দাসানুদাস
শ্রীহারাধন দত্ত।
বন্দনগঞ্জ পোষ্টাপিস
জেলা হুগলি।

শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতীর জীবন চরিত।

শ্রীবলরাম দাস কর্ত্তৃক প্রণীত।

শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভু যে ধর্ম্ম প্রচার করেন, সন্ন্যাসীরা তাহার সর্ব্ব প্রধান শত্রু ছিলেন। ইঁহারা একে সন্ন্যাসী বলিয়া সকলের নিকট সন্মানিত ছিলেন, তাহাতে আবার কঠিন বৈরাগ্য ও বহুতর শাস্ত্রাভ্যাস করিয়া, লোকের নিকট প্রায় নারায়ণের ন্যায় সন্মানিত হইতেন। ইঁহারা আপনাতে ও ভগবানে পৃথক ভাবিতেন না। অতএব শ্রীগৌরাঙ্গের যে ভক্তি পথ, সন্ন্যাসীদিগের মত উহার ঠিক বিপরীত। শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভুর সময় ভারতবর্ষে সন্ন্যাসীদের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান প্রকাশানন্দ সরস্বতী ছিলেন। তাঁহার সহিত শ্রীগৌরাঙ্গের তর্ক ও মিলন কাহিনী বর্ণনা করা এ পুস্তকের উদ্দেশ্য। ইহাতে লেখকের স্বকপোল কল্পিত কিছু নাই, সমস্তই প্রাচীন গ্রন্থ হইতে গৃহীত হইয়াছে। কাহিনীটী অতি মধুর।

মূল্য ডাক মাশুল সমেত ।/১০, ভেলুপেয়েবল পাঠাইতে দুই আনা অতিরিক্ত লাগিবে।

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত।

এই উপাদেয় গ্রন্থ সাধারণের কণ্ঠায়ত্ত হয়, ইহা ভক্তগণের নিতান্ত বাসনা। এইজন্য অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদক শ্রীগৌরাঙ্গ দাস শ্রীযুক্ত বাবু শিশির কুমার ঘোষ মহাশয় এই গ্রন্থখানি অতি উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে নির্ভুলরূপে মুদ্রাঙ্কিত করিয়াছেন। এই নিমিত্ত তিনি কয়েক খানি হস্তলিখিত পুস্তক সংগ্রহ করেন, তাহার মধ্যে একখানি ২০৭ বৎসর পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছিল।

স্থানে স্থানে টীকা দেওয়া হইয়াছে ও এ বিষয়ে ভক্তিবিনোদ শ্রীগৌরাঙ্গ দাস শ্রীযুক্ত বাবু কেদার নাথ দত্ত মহাশয়ও বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন।

এই অতি বৃহৎ গ্রন্থের মূল্য ১ টাকা নির্দ্ধারিত হইল এবং ইহাতে ইহার ব্যয় উঠা ব্যতীত লাভ হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। ডাক মাশুল ৵ তিন আনা। ভেলু পেয়েবল পোষ্টে দুই আনা অতিরিক্ত লাগিবে।

শ্রীচন্দ্র নাথ রায়
অমৃতবাজার পত্রিকার ম্যানেজার।
বাগবাজার কলিকাতা।

শ্রীশ্রী

বিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকা।

পাক্ষিক পত্র।

১ম বর্ষ } শ্রীশ্রীচৈতন্যাব্দ ৪০৫। ১লা বৈশাখ। { ৩য় সংখ্যা।

পণ্ডিত শ্রীপ্রভু রাধিকা নাথ গোস্বামী
ও
ভক্তি বিনোদ শ্রীযুক্ত কেদার নাথ দত্ত কর্ত্তৃক
সম্পাদিত।

—co○—

কলিকাতা।
বাগবাজার ২নং আনন্দ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের গলি
স্মিথ এণ্ড কোম্পানির যন্ত্রে
শ্রীকেশব লাল রায় দ্বারা
মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বার্ষিক মূল্য ২৲ প্রতি খণ্ড ৵

☞ পত্র প্রেরকগণ অনুগ্রহ পূর্ব্বক তাঁহাদের নাম ও ধাম স্পষ্ট করিয়া বাবু শিশির কুমার ঘোষ মহাশয়ের বরাবর পত্র লিখিবেন।

শ্রীশ্রী

বিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকা।

শ্রীগৌরাঙ্গ ও শ্রীরাধাকৃষ্ণ।

জীবগণকে ব্রজের নিগূঢ় রস বুঝাইয়া দেওয়া শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভুর অবতারের একটী মুখ্য উদ্দেশ্য। সুতরাং যাঁহারা ব্রজের শ্রীরাধাকৃষ্ণ ভজন করিতে বাসনা করেন অগ্রে তাঁহাদের শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভু ভজনা করা কর্ত্তব্য। এ কথা বলিতে আমরা সাহস করি না যে, শ্রীগৌরাঙ্গের ভজনা না করিলে শ্রীরাধাকৃষ্ণের ভজনা করা যায় না। কিন্তু এ কথা সাহস করিয়া বলিতে পারি যে, শ্রীগৌরাঙ্গের ভজনা করিলে শ্রীরাধাকৃষ্ণ ভজন সুলভ হয়।

যে সকল ভক্তগণ শ্রীগৌরাঙ্গকে ভজনা করেন, শ্রীরাধাকৃষ্ণের নামও গ্রহণ করেন না, সময় হইলে তাঁহাদের সম্মুখে শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভু পৃথকীকৃত হইয়া শ্রীরাধাকৃষ্ণ রূপে প্রকাশ হইয়া থাকেন। যে ব্যক্তির এই রূপ ভাগ্য হয় তাঁহার ভজন সাধনের পতন নাই, স্খলন নাই ও বিপদ নাই।

শ্রীগৌরাঙ্গের লীলা ধ্যান, মনন, স্মরণ, কীর্ত্তন প্রভৃতি করিতে করিতে ক্রমে মন নির্ম্মল হইবে, ও হৃদয় দর্পণের ন্যায় পরিস্কার হইয়া যাইবে। তখন হৃদয় দর্পণে শ্রীরাধাকৃষ্ণের ছবি প্রথমে অস্ফুটিত রূপে ও ক্রমে পরিস্কার রূপে প্রকাশিত হইবে। যাঁহারা শ্রীগৌরাঙ্গের লীলা অবগত নহেন, অথচ শ্রীরাধাকৃষ্ণ ভজন করেন, তাঁহাদের ভজনানন্দ কিরূপ হয় তাহা জানি না। তবে তাঁহারা যে শ্রীরাধাকৃষ্ণকে উপাসনা করেন, তাঁহারা দুই জনে একত্র হইয়া ও এক দেহ ধারণ

করিয়া আমাদের বাঙ্গলা দেশে আসিয়া কি করিলেন, তাহা উপরিউক্ত উপাসকদিগের জানা কর্ত্তব্য। তাঁহাদের নিকট আমাদের এই ভিক্ষা।

সাধক মাত্রেই জানেন যে পদ কর্ত্তারা শ্রীমতীকে যত ভাব দিয়াছেন তাহা তাঁহারা শ্রীগৌরাঙ্গের ভাব দর্শন করিয়া লিখিয়াছেন। শ্রীগৌর বিগ্রহে এমন ভাবও প্রকাশিত হইয়াছে, যাহা শ্রীমদ্ভাগবতেও নাই। এই সমস্ত ভাবিয়া চিন্তিয়া আমরা আপাতত শ্রীগৌরাঙ্গের লীলা বিষয়ক প্রস্তাব অধিক করিয়া লিখিতেছি।

মহাপ্রভুর রাধা ভাবে শ্রীকৃষ্ণ বিরহ।

স্নানোৎসবের পরে শ্রীজগন্নাথদেব অন্য গৃহে গেলেন। আর কপাট পড়িল। এইরূপে প্রতি বৎসর পঞ্চদশ দিবস জগন্নাথ দেব অদর্শন থাকেন। কপাট বন্দ হইলে, শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভু জগন্নাথ দেবকে দেখিতে না পাইয়া দুঃখিত হইয়া রোহিণী কুণ্ডের পাশে আসিলেন। সেখানে আসিয়া দুই জানুর মধ্যে মস্তক রাখিয়া জগন্নাথের বিরহে রোদন করিতে লাগিলেন। এইরূপ রোদন করিতে করিতে অবশ হইয়া ভূমিতে পড়িলেন।

শ্রীস্বরূপাদি ভক্তগণ তাঁহাকে পরিবেষ্টন করিয়া আছেন। প্রভুর মুখচন্দ্র মলিন হইয়া গিয়াছে, নয়ন হইতে কেবল অবিরত ধারা বহিতেছে। কাহার সহিত কোন কথা নাই, উঠিবার চেষ্টা নাই, কিম্বা পার্শ্ব পরিবর্ত্তনেরও চেষ্টা নাই। বহুক্ষণ প্রভু এইরূপে থাকিলে ভক্তগণ তাঁহাকে গৃহে লইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। অনেক যত্নের পর প্রভু নয়ন মেলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা চাও কি ?" তাহাতে সকলেই বলিলেন, "প্রভু ঘরে চলুন, স্নান আহার করুণ ও শান্ত হউন।"

প্রভু উত্তর করিলেন, "আমি যাবৎ জগন্নাথের কমল নয়ন দর্শন না করিব তাবৎ এস্থান ত্যাগ কি স্নান ভিক্ষা করিব না, কি কৃষ্ণ নাম পর্য্যন্ত লইব না। ইহা বলিয়া প্রভু নিরব হইলেন। ইহা শুনিয়া ভক্তগণ অত্যন্ত ভীত হইলেন, কারণ জগন্নাথ পঞ্চদশ দিবস অদর্শন থাকিবেন। কিন্তু কি করিবেন, সকলেই প্রভুকে ঘিরিয়া বসিয়া রহিলেন। প্রভু উঠিলেন না, স্নানাহারও করিলেন না। সেই সঙ্গে ২ কেহই উঠিলেন না, কি স্নানাহার করিলেন না। এইরূপে দিবা রাত্রি কাটিয়া গেল।

তাহার পর দিবস শ্রীস্বরূপ এই যুক্তি করিলেন যে শ্রীকৃষ্ণের রূপ গুণ সুধা পিয়াইয়া প্রভুকে শান্ত করিব। ইহা স্থির করিয়া, কয়েক জন ভক্ত মিলিত হইয়া মধুর স্বরে প্রভুকে ঘিরিয়া বংশীবদন ঠাকুরের এই পদটী গাইতে ও নৃত্য করিতে লাগিলেনঃ—

"মধুর মধুর বংশী বাজে, বনে।
দরবয়ে দারু শীল কুল, বিগলিত তরুকুল,
বিকশিত ব্রতী সনে।
পরমামৃত সিঞ্চিত, ভেল ত্রিভুবন,
গোকুল নাথ বদন বেনু গানে।
বংশী বদন ভনই, হরি বংশী কতই,
কলা রস কৌতুক জানে।"

সমস্ত পদটী এখানে দিলাম না। আর প্রভুর সমস্ত পদও শুনিতে হইল না, প্রথম পদটীতেই প্রভুর মন মজিয়া গেল।

পদটী গাইতে লাগিলে প্রভুর অঙ্গ প্রথমে পুলকিত হইল। চন্দ্র বদনের মলিনতা ও অঙ্গের বিবর্ণতা আর রহিল না। মুখশশী প্রফুল্লিত হইল, অঙ্গ হইতে তেজ রাশি নির্গত হইতে লাগিল। ইহা দেখিয়া ভক্তগণ আশ্বাসিত হইয়া আরো উৎসাহের সহিত গাইতে লাগিলেন। তখন প্রভু নয়ন মেলিলেন। আবার একটু পরেই উঠিয়া বসিলেন।

বসিয়া তালে তালে পদ সঞ্চালন করিতে লাগিলেন। আর একটু পরে কটী দোলাইয়া আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন। তখন ভক্তগণ নৃত্য সম্বরণ করিয়া শুদ্ধ প্রথম চরণটী অর্থাৎ "মধুর মধুর বংশী বাজে বনে" গাইতে লাগিলেন, আর প্রভুর আনন্দ তরঙ্গ দেখিতে লাগিলেন। ভক্তগণ এইরূপে নৃত্য করাইতে করাইতে প্রভুকে বাসা মুখে আনিতে লাগিলেন। প্রভু বাসায় আসিয়া বাহ্য জ্ঞান পাইলেন ও তখন ভক্তগণ সমভিব্যবহারে স্নান করিতে গেলেন।

শ্রীগৌরাঙ্গের মন্দির মার্জ্জন।

প্রভু বৎসর বৎসর নীলাচলে জগন্নাথের রথযাত্রার সময় ভক্তগণ লইয়া মন্দির মার্জ্জনা করিতেন, ইহা সকলেই জানেন। এক বৎসরের এই রূপ মার্জ্জনের পরে, পরস্পরের এইরূপ কথাবার্ত্তা চন্দ্রোদয়ে বর্ণিত আছে। কে কত কাঁকর ও আবর্জ্জনা কুড়াইয়াছেন ইহার পরীক্ষা হইলে দেখা গেল যে প্রভুর আবর্জ্জনার রাশি সর্ব্বাপেক্ষা বড়। ইহা দেখিয়া প্রভু হাসিয়া বলিলেন, "যাহার অল্প হইয়াছে তাহাকে দণ্ড করিব।"

ইহাতে অদ্বৈত হাঁসিয়া প্রভুকে বলিলেন, "তুমি গোয়ালা, দুধ খাও, ননী খাও, কাযেই তোমার সঙ্গে কে পারিবে ?"

প্রভু উত্তর দিলেন, "তাহা নয়, তাহা নয়, তোমার কার্য্য সংহার করা। (অদ্বৈত মহেশাবতার, তাহাই লক্ষ করিয়া প্রভু এ কথা বলিলেন।) অতএব তোমার জয় কেন হইবে ? যে লোককে সংহার করিয়া বেড়ায় তাহার কুশল হইবে কেন ?"

স্বরূপ ইহাতে অদ্বৈতের পক্ষ হইয়া বলিলেন, "কেন, গোয়ালা বুঝি সংহার করে না। গোয়ালা এমন কৃতঘ্ন ঘাতী যে, যে স্তন্য দুগ্ধ দেয়, তাহাকে বধ করে।"

প্রভু বলিলেন, "তোমাদের কথায় কি করে। যে ব্যক্তি সৎ

ভগবান জগন্নাথ তাহাকে জয় দেন। তিনি আমাকে জয় দিয়াছেন তাহাতেই প্রমাণ হইতেছে আমি সৎ আর তোমরা অসৎ।"

অদ্বৈত উত্তর দিলেন, "যে ব্যক্তি সুজন হয় সে কখন আপনাকে সাক্ষী মানে না। তোমার সাক্ষী জগন্নাথ আর তুমি জগন্নাথের সাক্ষী। ইহাতেই বুঝা যায় যে তোমরা কেমন সুজন।"

প্রভু হারি মানিলেন। আর ভক্তের নিকট তিনি চিরকাল এইরূপ হারি মানিয়া থাকেন।

শ্রীগৌরাঙ্গের গৃহত্যাগ।

পূর্ব্বে বলিয়াছি সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া প্রভু উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িলেন; কিন্তু এখানে দুই একটী কথা বলিবার আছে। প্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া কটীর ডুরিতে করঙ্গ বাঁধিলেন। পরে ভারতীকে প্রণাম করিয়া বলিলেন, "আমি বৃন্দাবনে চলিলাম, গুরু, তুমি আমাকে অনুমতি দাও।" ইহাই বলিয়া পশ্চিম দিকে ধাইলেন।

তখন প্রভুর সঙ্গে ২ শ্রীনিত্যানন্দ, চন্দ্র শেখর, মুকুন্দ ও গোবিন্দ দৌড়িলেন। আর যে লক্ষ লক্ষ লোক দাঁড়াইয়া সন্ন্যাস দেখিতে ছিল তাহারাও ধাবমান হইল। কাটোয়ার পশ্চিমে বন ছিল, পথ না পাইয়া সেই বন ভাঙ্গিয়া প্রভুর সঙ্গে ২ লক্ষ লক্ষ লোক ছুটিল। কেহ চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল, "তোমার সঙ্গে আমরাও যাব। তুমি একটু ধীরে যাও, আমরা অত দৌড়িতে পারি না।" তখন দর্শক মাত্রের মনে সংসারে অরুচি হইয়াছে। সকলেরি মনের ভাব যে, আর বাড়ী যাইব না। যখন এই নবীন গৌরাঙ্গ সুন্দর বৃক্ষতলবাসী হইলেন, তখন আর আমরা ঘরে কিরূপে থাকিব ? এইরূপ জনগণ পশ্চাতে ধাবমান হইলে মহা কলরব উপস্থিত হইল। তখন প্রভুর

কিঞ্চিৎ বাহ্য জ্ঞান হইল, ও তিনি ফিরিয়া করযোড়ে লোকদিগকে বিনয় বচনে বলিতে লাগিলেন, "মা! বাপ্! তোমরা বাড়ী যাও। বাড়ী গিয়া শ্রীকৃষ্ণ ভজন কর। আর আমাকে আশীর্ব্বাদ কর যেন আমি ব্রজে কৃষ্ণ পাই।" কিন্তু তবু লোক নিবৃত্ত হইল না। স্ত্রীলোকেরা বলিতে লাগিলেন, "পোড়া কপাল সংসারের, সংসারের মুখে আগুণ দি?" কিন্তু পরিশেষে সকলের কাজেই নিবৃত্ত হইতে হইল। প্রভুর পশ্চাৎ তাঁহারা যাইয়া উঠিতে পারিলেন না। প্রভুর গতি বিদ্যুতের ন্যায়, কাজেই তাহারা তাঁহাকে হারাইলেন ও তখন সকলে নিবৃত্ত হইলেন।

সে যাহা হউক তাঁহারা বাড়ী ফিরিলেন বটে, কিন্তু সংসারে আর কাহার মন গেল না। যাঁহারা প্রভুর সন্ন্যাস দর্শন করিয়াছিলেন তাঁহারা আবার সংসারে কিরূপে মন দিবেন? কেহ কেহ উন্মাদ হইয়া গেলেন, ও এইরূপ উন্মাদ দশা তাহাদের কিছুকাল রহিয়া গেল। যাহারা যাহারা শ্রীগৌরাঙ্গের সন্ন্যাসে কিছুকাল উন্মাদ ছিলেন, তাহার মধ্যে এক জনের নাম পুরুষোত্তম, আর এক জনের নাম গঙ্গাধর। যদি প্রভুর ইচ্ছা হয় ইহাদের কাহিনী পরে বলিব।

প্রভু দৌড়াইতেছেন, বাহ্যজ্ঞান মাত্র নাই। নয়ন মুদ্রিত, কটীতে করঙ্গ ঝুলিতেছে, হাতের দণ্ড পড়িয়া গিয়াছে, তাহা পশ্চাদবর্ত্তী ভক্তগণ কুড়াইয়া লইয়াছেন। উচু নিচু দেখিতে পাইতেছেন না। পথ আপথ জ্ঞান নাই। পশ্চিম পূর্ব্ব জ্ঞান নাই। কাহার সহিত কথা নাই। আহারে চেষ্টা নাই, নিদ্রা নাই, তৃষ্ণা নাই ও শরীরে ক্লান্তি নাই। কেবল অনবরত দৌড়াইতেছেন। প্রভুর মনের ভাব যে একে দৌড়ে বৃন্দাবন যাইবেন। নয়ন মুদ্রিত থাকাতে মুহুর্মুহু পদস্খলন হইতেছে, ও ভূমিতে আছাড় খাইতেছেন। তাহাতে তাঁহার দুঃখ নাই, উঠিয়া আবার দৌড়িতেছেন। এখানে এই প্রাচীন পদটী উদ্ধৃত করিলাম:—

"আরে মোর গৌরাঙ্গ নাগর।
প্রেম জলে তিতিল সোনার কলেবর॥
কটীতে করঙ্গ বাঁধি দিগ পথে ধায়।
প্রেমের ভাই নিতাই ডাকে ফিরিয়া না চায়॥
নিতাই বলে প্রভু যত পাতকী তরাইলে।
সে সব অধিক হবে আমা উদ্ধারিলে॥
যত যত অবতার অবনীর মাঝে।
পতিত পাবন নাম তোমায় যে সাজে॥"

যদিও প্রভুর বাহ্য জ্ঞান নাই, কিন্তু প্রভুর মনে একটী ভাবের তরঙ্গ খেলিতেছে, এবং একটী শ্লোক ও দুই একটী কথা দ্বারা সেই ভাবটী ব্যক্ত করিতেছেন। ভাগবতের একাদশের এতাং ইত্যাদি ভিক্ষুকের শ্লোকটী পাঠ করিতেছেন, আর বলিতেছেন "সাধু বিপ্র, মুকুন্দ ভজন ব্রত লইয়াছিলেন। আমিও বৃন্দাবনে যাইয়া নিশ্চিন্ত হইয়া মুকুন্দের চরণ ভজন করিব।" প্রভুর দিক্ বিদিক জ্ঞান নাই, সুতরাং যদিও দৌড়িতেছেন তবু দেশ ছাড়িয়া অধিক দূর যাইতে পারেন নাই।

চলিতে২ এক দিন নিশিতে প্রভু কোথা অনুদ্দেশ হইলেন। প্রভুকে না পাইয়া তাঁহার সঙ্গী ভক্তগণ হাহাকার করিতে লাগিলেন, কোন দিকে কেহ কোন উত্তর পাইলেন না। সকলে হতাশ হইয়া রোদন করিতেছেন, এমন সময় রোদনধ্বনি শুনিতে পাইলেন। রোদন শুনিয়া বুঝিলেন এ প্রভুর রোদন, আর কাহার নয়, কারণ সেরূপ করুণ রোদন শ্রীগৌরাঙ্গ ব্যতীত আর কাহার সম্ভবে না। সেই ধ্বনি অনুসরণ করিয়া তাহারা প্রভুর তল্লাসে বাহির হইলেন, যাইয়া দেখেন যে মাঠের মাঝখানে একটী বৃক্ষতলে প্রভু বসিয়া বাম হস্তে মুখ রাখিয়া উচ্চৈঃস্বরে ইহাই বলিয়া রোদন করিতেছেন, "বাপ্ কৃষ্ণ! তুমি কোথায় গেলে, আমি কি আর তোমাকে দেখিতে পাব না?

বাপ্ কৃষ্ণ! আমার প্রাণ! আমার সর্ব্বস্বধন! আমাকে ফেলে তুমি কোথা গেলে?" এইরূপ অনেক ক্ষণ রোদন করিয়া আবার উঠিয়া চলিলেন।

প্রভু পশ্চিম দিক্ ছাড়িয়া পূর্ব্ব মুখ হইলেন। তখন প্রভুর সঙ্গে কেবল নিত্যানন্দ ও চন্দ্রশেখর। মুকুন্দ ও গোবিন্দ সঙ্গে ২ যাইতে না পারিয়া প্রভুকে হারাইয়াছেন। প্রভু যখন পূর্ব্ব অর্থাৎ স্বদেশ মুখ হইলেন, তখন নিত্যানন্দ প্রভু চন্দ্রশেখরকে বলিলেন, "তুমি শীঘ্র নদে ফিরিয়া যাও। যাইয়া জননী শচী দেবী ও ভক্তগণকে শান্তিপুরে অদ্বৈত ভবনে লইয়া আইস, আমি প্রভুকে কোন ক্রমে সেখানে লইয়া যাইব।"

তখন তিন দিবস হইয়াছে। এ তিন দিবস কাহারও আহার কি নিদ্রা হয় নাই। প্রভু ঘুরিতে ঘুরিতে শান্তিপুরের তিন চারি ক্রোশ নিকটে আসিয়াছেন। আর নিত্যানন্দের তখন মনে আশা হইয়াছে যে প্রভুকে ফিরাইয়া লইয়া যাইতে পারিবেন। প্রভু চলিতেছেন ও সেখানে রাখালগণ গরু চরাইতেছে। নিত্যানন্দ প্রভুর মন ভাল জানেন। তিনি রাখালদিগকে শিখাইয়া দিলেন যে, তোমরা সকলে উচ্চৈঃস্বরে "হরিবোল" "হরিবোল" বল।

রাখালেরা এইরূপ শিক্ষিত হইয়া "হরিবোল" "হরিবোল" বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। প্রভুর নয়ন মুদিত ছিল। হরিধ্বনি যেই কর্ণে প্রবেশ করিল, অমনি স্থির হইয়া দাঁড়াইলেন। পরে নয়ন মেলিলেন। নয়ন মেলিয়া কোন্ দিক হইতে হরিধ্বনি হইতেছে তাহা নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন, ও রাখালগণকে দেখিয়া তাহাদের নিকটে গেলেন।

প্রভু বলিতেছেন, "রাখালগণ, তোমরা কি ব্রজবাসী? নতুবা এ হরিনাম তোমরা কোথা শিখিলে?" এখানে একটী প্রাচীন সঙ্গীত বলি।

প্রভু বলিতেছেনঃ—

"ও ব্রজের রাখালগণ,
এ নাম কোথা পেলি কে শিখালে, হরি বলরে॥
এই এখনি মরে ছিলাম।
হরিনাম শুনে প্রাণ পেলাম॥
আমার শ্রবণ উপবাসী ছিল।
হরিনামে আবার প্রাণ এল॥"

রাখালগণ প্রভুকে দেখিয়া আরো উৎসাহের সহিত হরিবোল বলিতে লাগিল। তখন প্রভু তাহাদের মস্তকে হাতদিয়া আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন। "বাপগণ! তোমরা আমাকে যেমন জুড়াইলে, ভগবান মুকুন্দ তোমাদিগকে সেইরূপ তৃপ্ত করুণ। বাপ্ বৃন্দাবনের আর কত দুর আছে?" এখানে বলরাম দাসের শ্রীগৌরাঙ্গাষ্টক হইতে একটী পদ দিতে ইচ্ছা হইতেছে। পদ যথাঃ—

"এক পুত্র বৃদ্ধা মাতা, নবীন যুবতী জায়া,
ক্ষুধা তৃষ্ণা রৌদ্র নিদ্রা আর।
রাখিতে নারিল যাকে, হরিনামে বান্ধে তাকে,
সেই গৌর মোর প্রাণেশ্বর॥"

প্রভু যে দুই দিবস পূর্ব্বে জনমের মত গ্রাম ও গৃহত্যাগ করিয়াছেন তাহা তাঁহার স্মরণ নাই। তাহার দুই দিবস পূর্ব্বে যে নদীয়ার সুখ বিলাস ছাড়িয়া বৃক্ষতলবাসী হইয়াছেন তাহা প্রভুর মনে নাই। প্রভুর নিমিত্ত তাঁহার বৃদ্ধা জননী যে নিরাশ সাগরে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতেছেন, কি তাঁহার নবীনা ভার্য্যা ভুবন অন্ধকার দেখিতেছেন, তাহাতে তাঁহার দৃক্‌পাত নাই। রাখালদিগের মুখে হরিনাম শুনিয়া আনন্দে ডগমগ হইয়া তাহাদিগকে মনের সহিত আশীর্ব্বাদ করিতেছেন। জীবগণ ক্ষুধায় মরে, তৃষ্ণায় মরে, অনিদ্রায় মরে, পরিশ্রমে মরে, কিন্তু ইহাতে প্রভুর কিছুমাত্র দুঃখ হয় নাই। প্রভুর দুঃখ যে তিনি তিন দিবস হরিনাম শুনেন নাই! জীবগণ দুই তিন দিবস অনাহারের

পর আহার করিলে বলিয়া থাকেন যে, এ তিন দিবস তাহারা আহারাভাবে মরিয়া ছিলেন, এখন প্রাণ পাইলেন। কিন্তু প্রভু অনাহারে মরেন নাই, হরিনাম না শুনিয়া মরিয়া ছিলেন, আর হরিনাম শুনিয়া রাখালগণকে বলিতেছেনঃ—

"এই এখনি মরে ছিলাম।
হরিনাম শুনে প্রাণ পেলাম॥"

প্রভু রাখালগণের নিকট বৃন্দাবন কত দুর আছে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, এ দিকে নদীয়ার কি অবস্থা তাহা এখন বলিতেছি। চন্দ্রশেখর নদীয়ায় আসিয়া প্রভুর সন্ন্যাসের কথা বলিলেন। আরো বলিলেন যে নিত্যানন্দ প্রভু তাঁহাকে শান্তিপুরে ভুলাইয়া আনিবেন এবং সেখানে শচী দেবীকে ও সকল ভক্তগণকে লইয়া যাইতে বলিয়াছেন। ভক্তগণ প্রভুর সন্ন্যাসের নিশ্চিত সংবাদ শুনিয়া হাহাকার করিয়া উঠিলেন। বাসুদেব ঘোষ সেই সময়কার অবস্থা প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়া লিখিতেছেনঃ—

"কি লাগিয়া দণ্ড ধরে, অরুণ বসন পরে,
কি লাগিয়া মুড়াইল কেশ।
কি লাগিয়া মুখ চাঁদে, রাধা রাধা বলি কান্দে,
কি লাগিয়া ছাড়িল নিজ দেশ॥
শ্রীবাসের উচ্চরায়, পাষাণ মিলায়ে যায়,
গদাধর না জীয়ে পরাণে।
বহিছে তপত ধারা, যেন মন্দাকিনী পারা,
মুরারীর এ দুই নয়নে॥
সকল মহান্ত ঘরে, বিধাতা বুঝাইয়া ফিরে,
তবু স্থির নাহি হয় কেহ।
জ্বলন্ত অনল হেন, রমণী ছাড়িল কেন,
কি লাগি তেজিল তার দেহ॥

কি কব দুঃখের কথা, কহিতে মরমে ব্যথা,
না দেখি বিদরে মোর হিয়া।
দিবা নিশি নাহি জানি, বিরহে আকুল প্রাণি,
বাসু ঘোষ পড়ে মুরছিয়া॥"

পণ্ডিত গঙ্গাদাস সন্ন্যাসের সংবাদ প্রভুর বাড়ীতে যাইয়া বলিলেন। শচী দেবীর কথা পরে বলিব; দেবী বিষ্ণুপ্রিয়ার কথা কিছু বলি। দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া যদিও নিতান্ত নবীনা, তবু এই সংবাদ শুনিয়া আপনার অবস্থা বুঝিতে পারিলেন। যে শ্রীগৌরাঙ্গ ভুবন মোহন, তিনি তাঁহার স্বামী। যে শ্রীগৌরাঙ্গ ভুবনকে আকর্ষণ করিতেছেন, সেই প্রভু তাঁহাকে ফেলিয়া যাইতেছেন। যে গৌরাঙ্গের শ্রীচরণ নিমিত্ত মুনিগণ সহস্র বৎসর তপস্যা করেন, সেই শ্রীগৌরাঙ্গের হৃদয়ে তাঁহার অধিকার আছে। একটু পূর্ব্বে তিনি ত্রৈলোক্য পূজিত, আর অদ্য পথের কাঙ্গালিনী, সম্বলের মধ্যে বৃদ্ধা শাশুড়ী। আবার ভাবিলেন যে শ্রীগৌরাঙ্গ তাঁহার হৃদয়ের ধন, অথচ কেবল মাত্র তিনি তাঁহাকে দেখিতে পাইবেন না, আর সকলে পাইবেন। আর তাঁহার স্বামী জগমাঝে সকলকে দেখিবেন ও সম্ভাষণ করিবেন, কিন্তু তাঁহার ছায়ামাত্র দেখিবেন না। বাসু দেবের আর একটী পদ এখানে বলিঃ—

"কান্দে দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া, নিজ অঙ্গ আছাড়িয়া,
লোটায়ে লোটায়ে ক্ষিতী তলে।
ওহে নাথ কি করিলে, পাথারে ভাসায়ে গেলে,
একা মুই এ ভুবন মণ্ডলে॥
এ ঘর জননী ছাড়ি, মুই অনাথিনী এড়ি,
কার বোলে করিলে সন্ন্যাস।
বেদে শুনি রঘুনাথ, জানকী লইয়া সাথ,
তবে সে করিল বনবাস॥

পূরবে নন্দের বালা, যবে মধুপুরে গেলা,
এড়িয়া সকল গোপীগণে।
উদ্ধবেরে পাঠাইয়া, নিজ তত্ত্ব জানাইয়া,
রাখিলেন তা সবারে প্রাণে ॥
চাঁদ মুখ না দেখিব, আর পদ না সেবিব,
না করিব সে সুখ বিলাস।
এ দেহ গঙ্গায় দিব, তোমার স্মরণ নিব,
বাসুর জীবনে নাহি আশ ॥”

শ্রীগৌরাঙ্গ, চন্দ্র সূর্য্য ও নিত্যানন্দকে সাক্ষী রাখেন ॥

নবদ্বীপে শ্রীগৌরাঙ্গ প্রকাশ হইয়াছেন। নূতন যৌবন, অমানুষিক রূপ, সুন্দর বসন। সর্ব্বাঙ্গ চন্দনে লেপিত, গলে মালতীর মালা, অতি সূক্ষ্ম শুভ্র উপবীত শ্রীঅঙ্গ বেড়িয়া শোভা করিতেছে। দুষ্ট লোকে ইহা দেখিয়া ঈর্ষা করিতে লাগিল।

আবার ভক্তগণ তাঁহাকে গৌরহরি, ও পূর্ণব্রহ্ম সনাতন বলিতে লাগিলেন, ও ভগবানের ন্যায় শ্রদ্ধা ভক্তি ও প্রেম করিতে লাগিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গের সুখ বিলাসের অবধি রহিল না। তাঁহার ভক্তগণ দেহ মন প্রাণ যথা সর্ব্বস্ব তাঁহাকে সমর্পণ করিয়াছেন। প্রতি দিবস তাঁহার বাড়ীতে বিবিধ উপহার আসিতেছে। যিনি যাহা সর্ব্বোৎকৃষ্ট দ্রব্য ভাবেন তাহার অগ্রভাগ প্রভুকে না দিয়া কেহ ভোগ করেন না। যিনি যখন দর্শন করিতে আসেন, হস্তে ফুলের মালা, চন্দন ও কোন উপাদেয় দ্রব্য লইয়া আইসেন।

এই সমস্ত দেখিয়া দুষ্ট লোকের সহ্য হইল না। তাহারা বলিতে লাগিল, “শচীর বেটা আবার ঠাকুর হইল? নিমাই পণ্ডিতের বড়

সুখ হয়েছে। ঠাকুর হয়েছেন, ক্ষীর ছানা চলিতেছে, আর দেখ না কেমন নাগর হইয়া বেড়ান? উহার নাগরালি ঘুচাইতে হইবে।” ইহাই বলিয়া ষণ্ডার দল তাঁহার শ্রীঅঙ্গে প্রহার করিবে এই পরামর্শ করিতে লাগিল।

অন্তর্য্যামী ভগবান ইহা জানিলেন, ক্রমে এ কথা প্রকাশ হইয়া পড়িল। তখন শ্রীগৌরাঙ্গ শ্রীনিত্যানন্দকে বলিলেন, “শ্রীপাদ, নগরে পরামর্শ হইতেছে যে আমাকে প্রহার করিবে, এ কথা আপনি শুনিয়াছেন?” এ কথায় শ্রীনিত্যানন্দ কি উত্তর দিবেন, অধোবদন হইয়া রহিলেন। পরে শ্রীগৌরাঙ্গ বলিলেন, “যাহারা আমাকে প্রহার করিবে পরামর্শ করিতেছে, তাহাদিগকে আমি জানি। আমি সন্ন্যাসী হইব। কৌপীন পরিয়া হাতে করোয়া লইয়া সেই সমুদয় লোকের বাড়ী যাইয়া ভিক্ষা মাগিব। আমার গার্হস্থ্য সুখ নাশ ও ভিক্ষুক অবস্থা দেখিলে আর তাহাদের আমার উপর ক্রোধ থাকিবে না। বরং দয়া হইবে ও তখন স্বচ্ছন্দে তাহারা হরিনাম গ্রহণ করিবে।”

পরে শ্রীগৌরাঙ্গ আবিষ্ট হইয়া, শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে ও চন্দ্র সূর্য্যকে সাক্ষ্য মানিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ বলিলেন, “শ্রীপাদ নিত্যানন্দ! তুমি সাক্ষী থাকিলে। চন্দ্র সূর্য্য তোমরা সাক্ষী রহিলে। আমার সন্ন্যাসে আমার নিজ জন বড় দুঃখ পাইবেন। কেহ কেহ ইহাতে আমার উপর ক্রোধ করিবেন, কেহবা মনের দুঃখে আমাকে ত্যাগ করিবেন। কোন কোন ভক্ত মন দুঃখে আমাকে নিন্দা করিবেন। কিন্তু তোমরা সাক্ষী রহিলে, আমি স্ব-ইচ্ছায় সন্ন্যাসী হইতেছি না। আমি জীবগণের তৃপ্তির নিমিত্ত সুখে বাস করিতেছিলাম। আমি ভাবিয়াছিলাম যে আমি সুখে থাকিলে তাহারা সুখী হইবে। কিন্তু আমার সুখ তাহাদের প্রিয়কর হইতেছে না। অতএব এই অবধি আমি দুঃখী ভিক্ষুক হইব, হইয়া জীবের মনোস্তুষ্টি করিব। অতএব তোমরা সাক্ষী থাকিলে, আমি যে ঘরের বাহির হইলাম, ইহাতে আমার কোন দোষ নাই।”

নিত্যানন্দ ও গৌরাঙ্গ।

নবীন যৌবন, গলিত কাঞ্চন,
কটি বেড়া রাঙ্গা বাস।
সন্ন্যাস করিয়া, করঙ্গ বান্ধিয়া,
ধায় গোরা উর্দ্ধশ্বাস ॥
কোটীর দড়িতে, করঙ্গ ঝুলিছে,
হাতে দণ্ড করি ধায়।
কে জানে তার মন, ভাবেতে বিভোর,
কোথা যায় গোরারায় ॥
লক্ষ লক্ষ লোক, সকলি উন্মত্ত,
ধুলায় পড়িয়া কান্দে।
শুদ্ধ নিতাইর, চক্ষে নাহি পাণি,
দৃষ্টি বাঁধা গোরা চাঁদে ॥
গোরা ধেয়ে গেল, চকিতের মত,
নিতাই দেখিল চক্ষে।
গৌরাঙ্গ দৌড়িল, নিতাই ধাইল,
সদা চোখে গোরা রাখে ॥
নিত্যানন্দ সনে, আর তিন জনে,
পাগলের মত ধায়।
নয়ন মুদিয়া, নিমাই দৌড়িছে,
দিক্ বিদিগ্ জ্ঞান নাই ॥
নিতাই কাতর, দৌড়িবারে নারে,
কিন্তু বিশ্রামিতে নারে।
মাত্র এক বার, আড়াল হইলে,
ধরিতে নারিব তারে ॥

নিমাই চলিছে, বিদ্যুতের মত,
নিতাই চলিতে নারি।
প্রভু প্রভু বলি, ডাকে উচ্চৈস্বরে,
দাঁড়া ভাই কৃপা করি ॥
আছাড়ে আছাড়ে, হাড় ভাঙ্গি গেল,
আমি তোর বড় ভাই।
তুহার সন্ন্যাসে, ভুবন আঁধার,
চোখে না দেখিতে পাই ॥
তুমি ফেলে গেলে, আমিতো তা নারি,
আর মোর নাহি কেহ।
কৌপীন পরেছ, ভালই করেছ,
আমা সঙ্গে করি লহ ॥
বিভোর নিমাই, আপনাতে নাই,
কোথা কি উত্তর দিবে।
নাহি কিছু জ্ঞান, উত্তান নয়ন,
নিমাই ভুলেছে সবে ॥
নিতাই ভাবিছে, ভাই বলি মিছে,
ভাই বলি না পাইব।
পতিত পাবন, কাঙ্গালের ধন,
বলি এবে সে ডাকিব ॥
কোথা দীন বন্ধু, অধম নিতাই,
বড় দুঃখে ডাকে তোরে।
দীনবন্ধু নাম, সফল করহ,
এ হেন কাঙ্গাল তরে ॥
এ হেন সময়, ভাবেতে গৌরাঙ্গ,
মুরছিয়া পড়ে ধরা।

পড়িতে পড়িতে, ধরিল বাহুতে,
উত্তান নয়ন গোরা ॥

কোলে শোয়াইল, ফেন বহে মুখে।
হতাশ নিতাই, জল নাহি চোখে ॥
জল বিন্দু নাই, বাঁচাহ নিমাই।
এক বিন্দু জল, এনে দেরে ভাই ॥
দুরন্ত সে মাঠ, কোথা লোক জন।
নিতাই চাহিছে, শুনে কোন জন ॥
ওষ্ঠাগত প্রাণ, কথা নাহি সরে।
নিতাইর হিয়া, যায় বিদরিয়া ॥
বলে আয় আয়, আয় জীবগণ।
তোদের কামনা, হইল পুরণ ॥
দীন দয়াময়, গোলক আশ্রয়।
সন্ন্যাস করিয়া, শোয়ালি ধরায় ॥
ধিক্ ধিক্ ধিক্, তু মানুষ জাতি।
নিদয় নিঠুর, চির বন্ধু ঘাতি ॥
তোরা ত আনিলি, নদীয়া হইতে।
তোরা সবে দিলি, দণ্ড প্রভু হাতে ॥
উঠিল গৌরাঙ্গ, চাহে ইতি উতি।
আবার ধাইল, বৃন্দাবন প্রতি ॥
যদি গৌরাঙ্গ, সন্ন্যাসী না হইত।
তবে কি জীবে, হরিনাম নিত ?

———

শ্রীচৈতন্য মঙ্গল গ্রন্থকর্ত্তা ঠাকুর লোচনানন্দের বংশ নাই। প্রবাদ এই যে একদা ইনি শ্বশুরালয় যাইতে ছিলেন। কিন্তু ঐ বাড়ী চিনিতে না পারিয়া গ্রামের একটী বালিকাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা, অমুকের বাড়ী কোথা ?" পরে প্রকাশ হইল যে ঠাকুর যে বালিকাটীকে মা বলিয়া সম্বোধন করেন সেটী তাঁহার স্ত্রী। তাহাতে দুই জনেই ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিলেন। লোচনানন্দ বৈদ্য কুলোদ্ভূত। ঠাকুর নরহরির বিশেষ কৃপা পাত্র। ইনি ছোট কালে বড় ধূর্ত্ত ছিলেন, অর্থাৎ লেখা পড়া করিতে তাঁহার বড় আপত্তি ছিল। তিনি দুই কুলের এক মাত্র তিলক ছিলেন। তাঁহার মাতা, তাঁহার মাতামহের একমাত্র কন্যা, আর তাঁহার মাতার তিনি একমাত্র পুত্র। কাযেই তিনি অত্যন্ত আদরের পাত্র ছিলেন। ঠাকুর লোচন নিজে লিখিয়াছেন যে, তাঁহাকে মারিয়া ধরিয়া কোন ক্রমে বর্ণ কয়েকটী শিখান হইয়াছিল। আবার এ নিতান্ত দৈন্যতার কথা নহে। কারণ তাঁহার স্বহস্ত লিখিত পুঁথি গুস্করা ষ্টেসনের নিকট কাঁকড়া গ্রামের বিখ্যাত চৈতন্য মঙ্গল কীর্ত্তনীয়া শ্রীপ্রাণবল্লভ চক্রবর্ত্তীর বাড়ীতে আছে। উক্ত পুস্তক তাঁহারা পূজা করিয়া থাকেন। শ্রীপ্রাণবল্লভ বলেন যে শ্রীলোচনের লিখিত অক্ষর গুলি উঠান যোড়া কয়ের মত। লোচন দাস ঠাকুরের বাড়ীতে অদ্যাপি এক খানা পাথর আছে। সেই পাথরের উপর বসিয়া তিনি তাঁহার গ্রন্থ প্রনয়ন করেন। এই পদ দুইটী ঠাকুরলোচনের ঃ—

"এই অবতারে যার রতি না হইল।
লোচন বলে সেই কেবল এল আর গেল ॥"

ঠাকুর লোচনের নিজ হস্ত লিখিত পুস্তকের নকল আমরা সংগ্রহ করিয়াছি। ছাপার যে চৈতন্য মঙ্গল দেখা যায় তাহাতে অনেক ভুল ও অনেক বাদ আছে। অতএব এই উপাদেয় গ্রন্থ খানি পুনর্মুদ্রিত করা কর্ত্তব্য। ভাল রূপে মুদ্রিত হইলে গ্রন্থ খানি সাধারণের বড় আদরের হইবে। তবে মাঝে মাঝে একটু টিপ্পনির আবশ্যক, তাহার কারণ

চৈতন্য মঙ্গলের পদ সমস্তই সুরে বাঁধা। কীর্ত্তনীয়াগণ এই পদগুলি সুরে বলেন, আবার কথা বলিয়া উহা পরিস্কার করিয়া বুঝাইয়া দেন। গ্রন্থে এই কথা গুলিন নাই, তাহাতে পদ গুলি স্থানে স্থানে বুঝিতে কষ্ট হয়।

গদারডিহির প্রভু গোস্বামীগণের কৃপায় প্রিয় দাস কৃত নূতন এক খানি ভক্তমাল আমরা দেখিয়াছি। এ খানি অতি বৃহৎ গ্রন্থ। ইহাতে গোস্বামী রঘুনাথ দাস সম্বন্ধে একটী কথা মনে পড়িল। দাস গোস্বামীর নীলাচলে জর হইয়াছে। লঙ্ঘন দিতেছেন, ও আট দিবস পরে জর ত্যাগ হইল। রজনী যোগে গোস্বামীর বড় ক্ষুধা হইয়াছে, আর সম্ভবত জ্বরের পরে একটু লোভও হইয়াছে। প্রভাত না হইলে পথ্য করিতে পাইবেন না, আর নিশি যোগে কেইবা তাঁহাকে পথ্য রান্ধিয়া বা সংগ্রহ করিয়া দিবে। সুতরাং তিনি মনে মনে সব কার্য্য করিতে লাগিলেন। অতি সূক্ষ্ম ৪ শের তণ্ডুল মনে মনে সংগ্রহ করিলেন। আর এইরূপ মনে মনে নানাবিধ শাক দধি ঘৃত সর্করা সংগ্রহ করিয়া মনে মনে রন্ধন করিলেন। পরে শ্রীগৌরাঙ্গকে সমুদয় নিবেদন করিয়া দিয়া মনে মনে তাঁহাকে সাধ মিটাইয়া খাওয়াইলেন ও তাহার পরে মনে মনে প্রসাদ পাইলেন। তাহার পর দিবস যখন শ্রীগৌরাঙ্গের প্রিয় সেবক শ্রীগোবিন্দ প্রভুকে মধ্যাহ্নে আহার করিতে বলিলেন, তখন প্রভু বলিলেন যে তাঁহার আহার করিতে রুচি নাই, তাঁহার অজীর্ণ হইয়াছে। ইহাতে গোবিন্দ একটু চিন্তিত হওয়াতে প্রভু হাঁসিয়া বলিলেন, 'স্বরূপের রঘু অসময় আমাকে আকণ্ঠ পুরিয়া ভোজন করাইয়াছে। অসময় গুরুতর আহার করাতে আর এখন ক্ষুধা নাই।' রঘুনাথ পীড়িত, আর তিনি নিশিতে প্রভুকে সেবা কি রূপে দিয়াছেন, গোবিন্দ বুঝিতে পারিলেন না। পরে রঘুনাথ গোস্বামীর নিকট গিয়া গোবিন্দ সুধাইলেন। তখন রঘুনাথ লজ্জা পাইয়া সকল কথা বলিলেন।

শ্রীশচীদেবীর বয়ঃক্রম।

শ্রীচরিতামৃত বলিতেছেনঃ—

"জগন্নাথ মিশ্র পত্নি শচীর উদরে।
অষ্ট কন্যা ক্রমে হইল জন্মি জন্মি মরে॥
তবে পুত্র জনমিল বিশ্বরূপ নাম।"

এখন অনুমান করুন যে শ্রীশচীদেবীর প্রথম কন্যা পঞ্চদশ বৎসরের সময় হইয়াছিল। আর বিশ্বরূপ দিয়া তাঁহার নয়টী সন্তান হয়। এইরূপ প্রত্যেক সন্তান প্রতি দুই বৎসর অন্তর হইলে বিশ্বরূপ যখন জন্ম গ্রহণ করেন তখন শ্রীশচীদেবীর বয়ঃক্রম ৩৩ বৎসর হইবে।

শ্রীচৈতন্য ভাগবত বলিতেছেনঃ—

"বিবাহের উদ্যোগ করয়ে পিতা মাতা।
শুনি বিশ্বরূপ বড় মনে পায় ব্যাথা॥
ছাড়িব সংসার বিশ্বরূপ ভাবে মনে।
বিশ্বরূপ সন্ন্যাস করিল কত দিনে॥"

শ্রীচৈতন্য মঙ্গল বলিতেছেনঃ—

"ষোড়শ বরিষ পুত্র ভেল বয়ক্রম।
বিবাহের যোগ্য রূপ যৌবন সম্পূর্ণ॥
এই মত কথা পিতা হৃদয়ে করিল।
বিশ্বরূপ যোগ্য কন্যা মনে বিচারিল॥"

ইহাতে বিশ্বরূপ মনে মনে ভাবিলেন যেঃ—

"বিবাহ করিব আমি নহেত উচিত।
নহে বা জননী দুঃখ পাবে বিপরীত॥
এই মনে অনুমানি রাত্রি সুপ্রভাতে।
বাহির হইয়া গেল পুথি বাম হাতে॥

গঙ্গাজল সন্তরণ করি পার হইল ।
গত মাত্র মহাশয় সন্ন্যাস করিল ॥”

অতএব ঠাকুরের বড় ভাই বিশ্বরূপ যখন সন্ন্যাস করেন, তখন তাঁহার বয়ক্রম ষোল বৎসর । আর তাহা হইলে শ্রীশচীদেবীর বয়ক্রম তখন ৪৯ বৎসর হইবে ।

বিশ্বরূপ যে শ্রীগৌরাঙ্গের কয় বৎসরের ব[illegible] করা কঠিন । কিন্তু দেখিতেছি যে বিশ্বরূপ যখন অদ্বৈত সভায় শাস্ত্র বিচার ও ভজন করিতে যাইতেন, তখন ঠাকুর গৌরাঙ্গ দিগাম্বর । শ্রীচৈতন্য ভাগবতে যথা—

“উষা কালে বিশ্বরূপ করি গঙ্গা স্নান ॥
অদ্বৈত সভায় আসি হয় উপস্থান ॥
সর্ব্ব শাস্ত্রে বাখানেন কৃষ্ণ ভক্তি সার ।
শুনিয়া অদ্বৈত সুখে করেন হুংকার ॥”

[illegible] সময় শ্রীগৌরাঙ্গ তাঁহাকে ডাকিতে আইলেন ঃ—

“দিগম্বর সর্ব্ব অঙ্গ ধুলায় ধুসর ।”

অতএব শ্রীগৌরাঙ্গের বয়স তখন ৫ । ৬ বৎসর হইবে ॥ ইহা হইলে ঠাকুর মহাপ্রভু বিশ্বরূপের আনুমানিক দশ বৎসরের ছোট হইবেন । পূর্ব্বে বলিয়াছি যে বিশ্বরূপযখন জন্ম গ্রহণ করেন তখন শ্রীশচীদেবীর বয়স ৩৩ বৎসর । সুতরাং প্রভু যখন অবতীর্ণ হন তখন জগজ্জননী শ্রীশচীদেবীর বয়ঃক্রম আনু-মানিক ৪৩ বৎসর হইবে ।

ঠাকুর যখন সন্ন্যাস করেন তখন তাঁহার বয়স ২৪ বৎসর ॥ অতএব তখন শ্রীশচীদেবীর বয়স ৬৭ বৎসর ।

প্রভু নীলাচলে গিয়া দক্ষিণ দেশে ভ্রমণ করিতে গমন করেন । এইরূপে প্রায় পাঁচ বৎসর যায় । সন্ন্যাসের পাঁচ বৎসর পরে প্রভু পুন-রায় স্বদেশে আগমন করেন । আর মাতা পুত্রে মিলন হয় । তখন শ্রীশচীদেবীর বয়ঃক্রম আনুমানিক ৭২ বৎসর । শ্রীচরিতামৃত পড়িলে জানা

যায় যে জগজ্জননী আরো কয়েক বৎসর কাল জীবিত ছিলেন । তিনি কবে অন্তর্ধান হয়েন তাহার নিদর্শন পাওয়া যায় না, কিন্তু মহাপ্রভুর স্বধামে গমনের যে বহুকাল অগ্রে তাহার আর সন্দেহ নাই ।

শ্রীনকুল ব্রহ্মচারীর পাঠ ।

অম্বিকা নগরের উত্তর পশ্চিম প্রান্তে প্যারীগঞ্জ বলিয়া একটী স্থান আছে । সেই স্থানে ব্রহ্মচারী ঠাকুরের পাট অদ্যাপিও বর্ত্তমান, আমরা সে দিবস প্রাতে ঐ পাট দর্শন করিতে গিয়াছিলাম । পাট বাটী ঐ প্যারিগঞ্জ গ্রামের মধ্যে একটু নিভৃত স্থানে অবস্থিত । প্রথমেই পুষ্পোদ্যান । পুষ্পোদ্যান পার হইয়াই সদর দ্বারে প্রবেশ করিলে একটী প্রাঙ্গন লক্ষিত হয় । প্রাঙ্গনের তিন দিকে তৃণাচ্ছাদিত গৃহ কএকটী দেখা যায় । এক দিকে শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর পাক বাড়ী । জ্ঞাত হইলাম যে এই পাট বাটীর অন্তর্গত সপ্ততি বিঘা ভূমি ও তাহাতে জলাশয় ও নানাবিধ বৃক্ষ আছে । এই সমস্ত ভূমির উপসত্বতেই মহাপ্রভুর সেবা হইয়া থাকে । নিকটবর্ত্তী গ্রাম সকল হইতেও অর্থ সাহার্য্য পাওয়া যায় । মহাপ্রভুর মন্দিরে শ্রীমহাপ্রভু ও নিত্যানন্দ বিরাজমান । একটী অতি সুন্দর গোপাল ও একটী শালগ্রাম আছেন । এই পাট বাটী গঙ্গা হইতে প্রায় অর্দ্ধ ক্রোশ ও বর্দ্ধমান যাইবার পাকা রাস্তা হইতে অর্দ্ধ পোয়া হইবে ।

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে এইরূপ লিখিত আছে ঃ—

“ভক্তে কৃপা করেন প্রভু এ তিন স্বরূপে ।
সাক্ষাৎ আবেশ আর আবির্ভাব রূপে ॥
সাক্ষাতে সকল ভক্তে দেখি নির্ব্বিশেষ ।
নকুল ব্রহ্মচারী দেহে প্রভুর আবেশ ॥

প্রদ্যুম্ন ব্রহ্মচারী যাঁর আগে নাম ছিল।
নৃসিংহানন্দ নাম প্রভু পাছেতে রাখিল ॥
তাঁহাতে হইল চৈতন্যের আবির্ভাব।”

পুনশ্চ শ্রীকবিকর্ণ পুর কৃত গৌরগণোদ্দেশ দীপিকায় —

“আবির্ভাবো গৌরহরে নকুল ব্রহ্মচারিণি।
আবেশশ্চ তথা জ্ঞেয়ো মিশ্রে প্রদ্যুম্ন সঙ্গকে।
আচার্য্যো ভগবান খঞ্জঃকলা গৌরস্য কথ্যতে ॥”

শ্রীচৈতন্য ভাগবতে যথা—

“আম্বুয়া মুলুকে নকুল ব্রহ্মচারী।”

অন্যত্র তত্রৈব

“এই মতে সপ্তগ্রামে আম্বুয়া মুলুকে।
বিহরেণ নিত্যানন্দ পরম কৌতুকে ॥”

বৈষ্ণব গ্রন্থের অনেক স্থানে এই প্রকার নকুল ব্রহ্মচারীর মাহাত্ম্য বর্ণিত আছে। অতএব তাঁহার পাট বাটী খানি বৈষ্ণব জগতে একটী প্রধান বিশ্রামের স্থল। নকুল ব্রহ্মচারী ত্যাগী বৈষ্ণব ছিলেন অতএব তাঁহার সন্তানাদি কেহ ছিল না। তাঁহার তিরোধান হইলে, তাঁহার কোন প্রিয় শিষ্য কর্তৃক ঐ স্থানটী পরিরক্ষিত হইত। শিষ্যানুশিষ্য ক্রমে ঐ পাট বাটী সন্তোষ দাস বাবাজীর হাতে পড়ে। সন্তোষ দাস বাবাজী শ্রীশ্রীমহাপ্রভু নিত্যানন্দের দুইটী শ্রীমূর্ত্তি প্রকাশ করেন। ব্রহ্মচারী ঠাকুরের সময় হইতে গোপাল বিরাজমান। পাট বাটীর মধ্যে সন্তোষ দাসের সমাধি দেখা যায়। কিছু দিন হইল এই পাট বাটীতে ব্রজ মোহণ দাস বলিয়া একটী মহান্ত ছিলেন। তাঁহার দেহত্যাগের সময় গোবিন্দ দাস বাবাজীকে মহান্ত ও ধাত্রীগ্রাম নিবাসী শ্রীযুত অন্নদা প্রসাদ মজুমদার মহাশয়কে অছি নিযুক্ত করেন।

কিছু দিন হইল মহান্ত গোবিন্দ দাস বিদেশে দেহ ত্যাগ করেন

সেই অবধি প্রায় মহান্তের গদি শূন্য প্রায় আছে। একটী বড় শোচনীয় কথা এই স্থলে প্রকাশ করিতে হইতেছে। আমরা যে দিবস পাট বাটী দর্শনে গেলাম, সে দিবস মহাপ্রভুর বাটী প্রাতে বন্ধ ছিল। ডাকা ডাকি করিয়া দ্বার খোলা গেল। একটী মহারাষ্ট্রীয় বৈষ্ণবকে দেখিলাম। তিনি কয়েক দিন হইতে প্রভুদের পরিচর্য্যা করিতেছেন। কিন্তু তিনি সে স্থানে থাকিতে অসন্তুষ্ট এবং শীঘ্র স্থানটী পরিত্যাগ করিবেন। তাহা হইলে মহাত্মা ব্রহ্মচারি ঠাকুরের পাটের সেবা কার্য্য চলা দুর্ঘট হইয়া উঠিবে। শোচনীয় বিষয়টী এই যে মহান্ত গোবিন্দ দাস একটী স্ত্রীলোক সংগ্রহ করিয়া ঐ পাট বাটীতে রাখেন এবং অপর আর একটী স্ত্রীলোক আসিয়া তথায় অনেক দিন হইতে আছে। এখন দেখিলে বোধ হয় ঐ পাটটী স্ত্রীলোক দিগের হস্তে পড়িয়াছে এবং তাহারাই উহার কর্তৃপক্ষ। তাহারাই পুজারি বাবাজীকে বেতন দিয়া রাখিয়াছে। আহা! কি দুঃখের বিষয়! গোবিন্দ দাস বাবাজীর ন্যায় মহান্তদিগের জন্য গৌড় ভূমির দেবালয় সকল দূষিত হইয়া গেল। আমাদের প্রাণনাথ শ্রীগৌরাঙ্গদেব এই প্রকার দোষ আশঙ্কা করিয়াই ছোট হরি দাসকে বৈষ্ণব সমাজ হইতে চ্যুত করিয়াছিলেন। তাহা দেখিয়াও কি ধর্ম্মধ্বজীদিগের ভয় হয় না? শাস্ত্রে সিদ্ধান্ত এই যে, বৈষ্ণব দুই প্রকার, গৃহস্থ ও ত্যাগী। গৃহস্থ বৈষ্ণব স্ত্রী পুত্র লইয়া বৈষ্ণব সংসারে অবস্থিতি করতঃ নির্ম্মল বৈষ্ণব ধর্ম্মের যাজন করিবেন। ত্যাগী বৈষ্ণব স্ত্রীসঙ্গ এক কালীন পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভজনালয়ে অথবা তীর্থে তীর্থে ভ্রমণ করতঃ ভক্তি দেবীর অনুশীলনে প্রবৃত্ত থাকিবেন। গৃহস্থ বৈষ্ণব বিরাগ লাভ করিলে ত্যাগী পদ পাইবার অধিকারী হন। ত্যাগের পর আর স্ত্রী গ্রহণে তাঁহার অধিকার নাই। গ্রহণ করিলে আর তিনি বৈষ্ণব থাকেন না। শাস্ত্রের বিধান এই যে, যে পর্য্যন্ত হৃদয়ে সংসারের প্রতি অনুরাগ আছে সে পর্য্যন্ত স্ত্রী পুত্রাদি পরিত্যাগ পূর্ব্বক সন্ন্যাস গ্রহণে অধিকার জন্মে না। অতি অল্প বয়সে ক্ষণিক

বৈরাগ্য ক্রমে যাঁহারা ভেক লন, তাঁহারাই কিছু দিনের মধ্যে লাম্পট্য আচরণ পূর্ব্বক পতিত হন। যাহারা ঐ সকল ব্যক্তিকে ভেক দেন, তাহারাও সুতরাং নরকে গমন করেন।

যথা সংসার সিদ্ধান্তে —

"অপ্রাপ্তে চাধিকারে যঃ কুর্য্যাদুচ্চাশ্রমাশ্রয়ং।
নাস্তি তস্য শুভং ক্বাপি গতির্নিরয়েরিব ॥"

অন্যত্রতু তত্রৈব —

"অন্যথাহ কাল সন্ন্যাস গ্রহণেন ক্ষিপ্রং তদাশ্রম ভ্রষ্টতাহ বশ্যম্ভাবী। সন্ন্যাস দাতুর্গুরোরোপি পতনমবশ্যং।"

আমরা অনুসন্ধান করিয়া জানিলাম, যে এই মঠ গোবিন্দ দাসের পূর্ব্বে কখনই দূষিত হয় নাই। ব্রহ্মচারী ঠাকুরের সময় হইতে ব্রজমোহন দাসের সময় পর্য্যন্ত এই মঠটী বিশুদ্ধ অভ্যাগত বৈষ্ণবদিগের আশ্রয় ছিল। নিকটবর্ত্তী গ্রাম সমূহের ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ ঐ মঠে আগমন করিয়া প্রসাদ পাইতেন। গোবিন্দ দাসের সময় হইতে তাহা প্রায় রহিত হইয়াছে। যদিও কোন কুলাঙ্গার কর্ত্তৃক এই মঠ কিছু দিনের জন্য দূষিত হইয়াছে, তথাপি অতি স্বল্প চেষ্টায় ইহার উদ্ধার হইতে পারে। ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও বিশুদ্ধ বৈষ্ণবগণের এই স্থানের প্রতি এখনও বিশেষ অনুরাগ আছে এমন কি যদি অদ্যই একটী সুবৈষ্ণবের হাতে এই মঠটী অর্পিত হয় তাহা হইলে কল্য হইতেই এই মঠের পূর্ব্বাবস্থা প্রবৃত্ত হইবে।

দেখিতেছি ব্রজমোহন দাস শ্রীযুক্ত অন্নদা প্রসাদ মজুমদার মহাশয়কে অর্পণ নামা দ্বারা গোবিন্দ দাসের অভাবে মহান্ত নিযুক্ত করিবার অধিকার দিয়াছেন। অতএব মজুমদার মহাশয়ের কার্য্যের উপর সমস্তই নির্ভর করিতেছে। আমরা আশা করি মজুমদার মহাশয় আর কালাতিপাত না করিয়া একটী পরিণত বয়স্ক বিশুদ্ধ ত্যাগী বৈষ্ণবকে এই মঠের মহান্ত নিযুক্ত করিবেন।

—:০:—